

ফাঈল



It isn't cover

মুতাদ শোষ

*If you want to download
a lot of ebook,
click the below link*



**Get *More*
Free
eBook**

**VISIT
WEBSITE**

www.banglabooks.in

Click here



ফসিল

সুবোধ ঘোষ

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক—শ্রীমুখ্যপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাট্টোজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫৭
দাম ২৥০ টাকা

মুদ্রাকর শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড,
পি ১৬, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা

সূচী

গল্প		পৃষ্ঠা
ফসিল	...	১
যাযাবর	...	১৯
শক খেরাপী	...	৪০
অযান্ত্রিক	...	৬২
দণ্ডমুণ্ড	...	৭৫
শ্লানিহর	...	৯৭
সুন্দরম	...	১০৮
সবলা	...	১২৭
গোত্রান্তর	...	১৪৩

কয়েকটি অভিমত

স্ববোধবাবুর গল্পগুলির মধ্যে আমরা এক নূতন সন্ধান পাইয়াছি এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের গতানুগতিকতার মোড় ফিরিতেছে এবং ফিরিবে।.....বস্তুনিষ্ঠা, কথাবস্তুর মনোহারিত্ব, সংলাপ-চাতুর্য্য এবং অনবগু গঠননৈপুণ্যের মধ্য দিয়া গল্পগুলি এক অনিবার্য্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।.....বুঝা যায়, সমাজের নানা স্তরের জীবনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ, অভিজ্ঞতা কত বিস্তৃত এবং অধ্যয়ন কত ব্যাপক।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

লেখক অল্পদিনের মধ্যেই কথাসাহিত্যিকরূপে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়া যশস্বী হইয়াছেন।..... তাঁহার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত, পর্য্যবেক্ষণ নিপুণ এবং ভাষা বলিষ্ঠ—জীবননীতিতে তিনি প্রগতিশীল।.....এই গল্পগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, আধুনিক বাংলা গল্প কি আঙ্গিক আর কি বিষয়বস্তু, কোনদিকেই অগ্রাগ্র দেশের গল্পসাহিত্য হইতে পিছাইয়া নাই।

—যুগান্তর

বাংলা গল্পের প্রকৃতি যে বদলাচ্ছে তার প্রমাণ স্ববোধ ঘোষের এই প্রথম বইখানি।..... সামাজিক চৈতন্যই শুধু লেখককে উদ্বুদ্ধ করেনি, আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের প্রভাবও তাঁর ওপর বেশ সক্রিয়। সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রকে কাজে লাগিয়ে অমন পূর্ণাঙ্গ গল্প তৈরী করা বিশ্বয়কর।.....এ জাতের গল্প নিয়ে কিছুকাল থেকে বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা চলছিল বটে, কিন্তু তা সফল হলো এই প্রথম।..... স্ববোধ ঘোষের ছোটগল্প পাঠককে যে-রকম গভীরভাবে আলোড়িত ও অভিভূত করে তার তুলনা সমসাময়িক কথাসাহিত্যে বিরল।

—পরিচয়

ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের হাতে যৌবনের পরিপূর্ণ নিটোল সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছিল।.....অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ ইহাতে হৃষ্টির মৌলিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।.....সম্প্রতি শ্রীযুক্ত স্ববোধ ঘোষের দুইখানি গল্প-সংগ্রহ ‘ফসিল’ ও ‘পরশুরামের কুঠার’, ইহার আটকে নূতনভাবে রূপায়িত করিয়াছে।

নূতনপত্র : ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফসিল

নেটিভ স্টেট অঙ্গনগড় ; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-আট বর্গমাইল । তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই । মহারাজা আছেন ; ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজারং সব আছে । এককুড়ির উপর মহারাজার উপাধি । তিনি ত্রিভুবনপতি ; তিনি নরপাল, ধর্মপাল এবং অরাতিদমন । হু'পুরুষ আগে এ-রাজ্যে বিজুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হ'ত ; এখন সেটা আর সম্ভব নয় । তার বদলে শুধু ঝাংটো ক'রে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয় ।

সাবেক কালের কেলাটা যদিও লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট । কেলায় ফটকে বুনো হাতীর জীর্ণ কঙ্কালের মতো ছোটো মরচে-পড়া কামান । তার নলের ভেতর পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে ; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা বিমোয় । দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ী আর তরবারির ঘটা ; দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মত তামা আর লোহার ঢাল ।

একজন অমাত্য, আটজন প্রধান আর—ফৌজদার, আমিন, কোতোয়াল, সেরেস্তাদার । ক্ষত্রিয় আর মোগল এই দু'জাতের আমলাদের যৌথ-প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন । সেই অপূর্ব অভুত শাসনের ঝাঁজে রাজ্যের অর্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে ।

সাড়ে-আট বর্গমাইল অঙ্গনগড়—শুধু ঘোড়ানিম আর ফণীমনসায় ছাওয়া রুক্ষ কাঁকরে মাটির ডাঙা আর নেড়া নেড়া পাহাড় । কুর্শি আর ভীলেরা হু'ক্ৰোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ডগুলি থেকে

ফসিল

মোষের চামড়ার খলিতে জল ভরে আনে—জমিতে সেচ দেয়—ভুট্টা, যব আর জনার ফলায় ।

প্রত্যেক বছর স্টেটের তসীল বিভাগ আর ভীল ও কুর্শি প্রজাদের ভেতর একটা সংঘর্ষ বাধে । চাষীরা রাজভাণ্ডারের জ্ঞা ফসল ছাড়তে চায় না । কিন্তু অর্ধেক ফসল দিতেই হবে । মহারাজার স্বগঠিত পোলো টীম আছে । হয়শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের হেয়ারবে রাজ-আস্তাবল সতত মুখরিত । সিডনির নেটিভ এই দেবতুল্য জীবগুলির ওপর মহারাজার অপার ভক্তি । তাদের তো আর খোল ভূমি খাওয়ানো চলে না । ভুট্টা, যব, জনার চাই-ই ।

তসীলদার অগত্যা সেপাই ডাকে । রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে ক্ষাত্রবীৰ্যের ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয় । এক ঘণ্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ—বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায় ।

পরাজিত ভীলদের অপরিমেয় জংলী সহিষ্ণুতাও ভেঙে পড়ে । তারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে ভর্তি হয় সোজা কোন ধাঙড়-রিক্রুটারের ক্যাম্পে । মেয়ে মরদ শিশু নিয়ে কেউ যায় নয়াদিল্লী, কেউ ক'লকাতা, কেউ শিলং । ভীলেরা ভুলেও আর ফিরে আসে না ।

শুধু নড়তে চায় না কুর্শি প্রজারা । এ-রাজ্যে তাদের সাতপুরুষের বাস । ঘোড়ানিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোট বড় এমন ঠাণ্ডা মাটির ডাঙা, কালমেঘ আর অনন্তমূলের চারার এক একটা ঝোপ ; সালসার মত স্বগন্ধ মাটিতে । তাদের যেন নাড়ীর টানে বেঁধে রেখেছে । বেহায়ার মত চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়—ঋতুচক্রের মত এই ত্রিদশার আবর্তনে তাদের দিনসন্ধ্যার সমস্ত মুহূর্তগুলি ঘুরপাক খায় । এদিক ওদিক হবার উপায় নেই ।

তবে অঙ্গনগড় থেকে দয়াদর্শ একেবারে নির্বাসিত নয় । প্রতি

ফসিল

রবিবারে কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের ওপর দুস্থ জমায়েত হয়। দরবার থেকে বিতরণ করা হয় চিঁড়ে আর গুড়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে-আল্লনা-আঁকা হাতীর পিঠে চড়ে জলুস নিয়ে পথে বার হন—প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনে কেল্লার আড়িনায় রামলীলা গান হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি সেখানে লাঠি চলবেই আর হুচারটে অভাগার মাথা ফাটবেই। চিঁড়ে, আশীর্বাদ বা রামলীলা—সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়; প্রজারা সেই ভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।

লাঠিত্ত্বের দাপটে স্টেটের শাসন, আদায় উন্মূল আর তসীল চলছিল বটে কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল তাতে গদির গৌরব টিকিয়ে রাখা যায় না। নরেন্দ্রমণ্ডলের চাঁদা আর পোলো টিমের খরচ! রাজবাড়ীর বাপেরকেলে সিন্দুকের রূপো আর সোনার গাদিতে ক্রমে ক্রমে হাত পড়ল।

অঞ্জনগড়ের এই অদৃষ্টের সন্ধিক্ষণে দরবারের ল-এজেন্টের পদে আনানো হ'ল একজন ইংরেজী আইননবীশ। আমাদের মুখার্জীই এল ল-এজেন্ট হয়ে। মুখার্জীর চণ্ডা বুক—যেমন পোলো ম্যাচে তেমনি স্টেটের কাজে অচিরে মহারাজার বড় সহায় হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমে মুখার্জীই হয়ে গেল ডি ফ্যাক্টো অমাত্য, আর অমাত্য রইলেন শুধু সই করতে।

আমাদের মুখার্জী আদর্শবাদী। ছেলেবেলার হিষ্টি-পড়া মার্কিনী ডিমোক্রেসীর স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত শাস্ত্রবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে—যে সং-সাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

ফসিল

মুখাজ্জী তার প্রতিভার প্রতিটি পরমাণু উজাড় করে দিল স্টেটের উন্নতি সাধনায়। অঞ্জনগড়ের আবালবৃদ্ধ চিনে ফেলল তাদের এজেন্ট সাহেবকে—একদিকে যেমন কড়া অস্ত্র দিকে তেমনি হৃদয়দরদী। প্রজারা ভয় পায় ভক্তিতে করে। মুখাজ্জীর নির্দেশে বন্ধ হ'ল লাঠিবাজি। সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে তোলপাড় করে তুললো। স্টেটের জরীপ হ'ল নতুন করে; সেন্সাস নেওয়া হ'ল। এমন কি মরচে-পড়া কামান ছুটোকেও পালিস করে চকচকে করে ফেলা হ'ল।

ল-এজেন্ট মুখাজ্জীই একদিন আবিষ্কার করল অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ। রত্নগর্ভ অঞ্জনগড়—তার গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর আসবেস্টসের স্তূপ। ক'লকাতার মার্চেন্টদের ডাকিয়ে ঐ কাঁকরে মাটির ডাঙাগুলি লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।

আজ কেল্লার এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিরাম গোয়ালিয়রী স্টাইলের প্যালেস। মার্কেল, মোজ্যিক, কংক্রীট আর ভিনিসিয়ান সার্মীর বিচিত্র পরিসজ্জা! সরকারী গ্যারেজে দামী দামী জাম্পান লিমুজিন, সিডান আর টুরার। আস্তাবলে নতুন আমদানী আইরিশ পনির অবিরাম লাখালাখি। প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস—দিবরাত্র ধক্ ধক্ শব্দে অঞ্জনগড়ের নতুন চেতনা আর পরমাণু ঘোষণা করে।

সত্যিই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চেন্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে—মাইনিং সিণ্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে গড়ে উঠেছে খোয়াবাঁধানো বড় বড় সড়ক, কুলির ধাওড়া, পাম্প-বদান ইঁদারা, ক্লাব, বাংলো, কেয়ারি-করা ফুলের বাগিচা আর জিমখানা। কুর্খি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরী পায়,

ফসিল

শুয়ের বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে ।

মহারাজা এইবার প্র্যান আটছেন—ছুটো নতুন পোলো গ্রাউণ্ড তৈরী করতে হবে ; আরো এগার কাঠা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে । নহবতের জন্ত একজন মাইনে-করা ইটালীয়ান ব্যাণ্ড মাস্টার হ'লেই ভাল ।

অঞ্জনগড়ের মানচিত্রটা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে মুখার্জী বিভোর হয়ে ভাবে—তার ইরিগেশন স্কীমটার কথা । —উত্তর থেকে দক্ষিণ, সমান্তরাল দশটা ক্যানেল । মাঝে মাঝে খিলান-করা কড়া-গাঁথুনির প্লুস-বসানো বড় বড় ডাম । বরাকরের বর্ষার সমস্ত ঢলটাকে কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভেতর চালিয়ে দিতে হবে—রক্তবাহী শিরার মত । প্রত্যেক কুশ্মি প্রজাকে মাথা পিছু তিন কাঠা জমি । আউশ আর আমন ; তা ছাড়া একটা রবি । বছরে এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে । উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্সারী, আলু আর তামাক ; দক্ষিণেরটায় আখ, যব, আর গম । তারপর—

তারপর ধীরে একটা ব্যাঙ্ক ; ক্রমে একটা ট্যানারী আর কাগজের মিল । রাজকোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই । এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ ! শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত এক একটা এন্টিমেটে সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে । সে দেখিয়ে দেবে রাজ্যশাসন লাঠিবাজি নয় ; এও একটা আর্ট ।

একটা স্কুল—এইটাতে মহারাজার স্পষ্ট জবাব, কভি নেহি । মুখার্জী উঠলো ; দেখা যাক বুঝিয়ে বাগিয়ে মহারাজার আপত্তিটা টলাতে পারে কি না ।

মহারাজা তাঁর গালপাট্টা দাড়ির গোছাটাকে একটা নির্মম মোচড় দিয়ে মুখার্জীর সামনে এগিয়ে দিল ছুটো কাগজ—এই দেখ ।

ফসিল

প্রথম পত্র—প্রবল প্রতাপ দরবার আর দরবারের ঈশ্বর মহারাজ !
আপনি প্রজার বাপ । আপনি দেন বলেই আমরা খাই । অতএব এ বছর ভুট্টা, যব, জনার যা ফলবে, তাতে যেন সরকারী হাত না পড়ে । আইনসঙ্গতভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ নেব । ইতি দরবারের অহুগত ভৃত্য : কুশ্মির সমাজের তরফে ছুলাল মাহাতো বকলম খাস ।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভেতর ঢুকে চারজন কুশ্মির কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীদের লাঠি দিয়ে মেরেছে । আমরা একে অধিকারবিরুদ্ধ মনে করি এবং দাবী করি মহারাজার পক্ষ থেকে শীঘ্রই এ-ব্যাপারের স্তমীমাংসা হবে । ইতি সিগুকেটের চেয়ারম্যান গিবসন ।

মহারাজা বললেন—দেখছ তো মুখাজ্জী, শালাদের হিম্মৎ ।

—হ্যাঁ, দেখছি ।

টেবিলে ঘুসি মেরে বিকট চীৎকার করে অরাতিদমন প্রায় ফেটে পড়ল—মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে । আমি বসে বসে দেখি ; দুদিন হু'রাত ধরে দেখি ।

মুখাজ্জী মহারাজকে শাস্ত করল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন । আমি একবার ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করি আসল ব্যাপার কি ।

বৃদ্ধ ছুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে । বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটা টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে । তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুশ্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা—একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে ।

কুশ্মির ছুলালের কাছে শিখেছে—নগদ মজুরী কি জিনিষ ।

ফসিল

ফয়জাবাদ স্টেশনে কোন বাবুসাহেবের একটা দশসেরী বোঝা ট্রেনের কামরায় তুলে দাও। বাস—নগদ একটা আনা, হাতে হাতে।

দুলাল বলতো—ভাইসব, এই বুড়োর মাথায ষাটা সাদা চুল দেখছ ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অগ্র হাতে সেলাম করবে।

সিগুকেটের সাহেবদের সঙ্গে দুলাল সমানে কথা চালায়। কুলিদের মজুরীর রেট, হপ্তা পেমেন্ট, ছুটি, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এ সব সে-ই কুশ্মিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিগুকেটও দুলালকে উঠতে বসতে তোয়াজ করে—চলে এস দুলাল। বলতো রাতারাতি বিশ ডজন ধাওড়া করে দি। তোমার সব কুশ্মিদের ভর্তি করে নি।

দুলাল জবাব দেয়—আচ্ছা, সে হবে। তবে আপাততঃ কুলি পিছু কিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফতি দেবার অর্ডার হোক।

—আচ্ছা তাই হবে। সিগুকেটের সাহেবরা তাকে কথা দিত।

দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুশ্মি একত্রিত হ'ল ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাকাচুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়ীটা খুলে হাতে নিয়ে দুলাল দাঁড়ালো—আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এখন ভাব কি করা উচিত। চিনে দেখ কে আমাদের দুশমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জৎ, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোন মতেই ক্ষমা নয়।

ভাঙা শঙ্খের মত দুলালের স্ববির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে

ফসিল

কৈপে কৈপে আওয়াজ ছাড়ল—ভাই সব, আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ
মণ্ডলের জন্ত, আর মণ্ডলের প্রাণ... ।

কুশ্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যন্তর দিল—মাহাতোর
জন্ত ।

ঢাক ঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা । তারপর
ষে যার ঘরে গেল ফিরে ।

ঘটনাটা যতই গোপনে ঘটুক না কেন মুখাজ্জীর কিছু জানতে বাকী
রইল না । এটুকু সে বুঝল—এই মেঘেই বজ্র থাকে । সময় থাকতে
চটপট একটা ব্যবস্থা দরকার । কিন্তু মহারাজা যেন ঘুণাশ্বেবেও জানতে
না পায় । ফিউডলী দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জৎ কমপ্লেক্সে জর্জর এই সব
নরপালদের তা হ'লে সামলানো দুষ্কর হবে । বৃথা একটা রক্তপাতও
হয় তো হয়ে যাবে । তার চেয়ে নিজেই একহাত ভদ্রভাবে লড়ে নেওয়া
যাক ।

পেয়াদারা এসে মহারাজাকে জানালো—কুশ্মিরা রাজবাড়ীর বাগানে
আর পোলো লনে বেগার খাটতে এল না । তারা বলছে—বিনা মজুরীতে
খাটলে পাপ হবে ; রাজ্যের অমঙ্গল হবে ।

ডাক পড়ল মুখাজ্জীর । দুলাল মাহাতোকেও তলব করা হ'ল ।
জোড় হাতে দুলাল মাহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়ালো । মেঘশিশুর মত
ভীক—দুলাল যেন ঠক ঠক করে কাঁপছে ।

—তুমিই এসব সয়তানী করছ ! মহারাজা বললেন ।

—হজুরের জুতোর ধুলো আমি ।

—চুপ থাক ।

—জী সরকার ।

ফসিল

—চূপ! মহারাজা জীমূতধ্বনি করলেন। দুলাল কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল।

—ফিরিজি বেনিয়াদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আমার বিনা হুকুমে কোন কুশ্মি খনিতে কুলি খাটতে পারবে না।

—জী সরকার। আপনার হুকুম আমার জাতকে জানিয়ে দেব।

—যাও।

দুলাল দণ্ডবৎ করে চলে গেল। এবার আদেশ হ'ল মুখার্জীর ওপর।
—সিগুকেটকে এখুনি নোটিশ দাও, যেন আমার বিনা সুপারিশে আমার কোন কুশ্মি প্রজাকে কুলির কাজে ভর্তি না করে।

অবিলম্বে যথাস্থান থেকে উত্তর এল একে একে। দুলাল মাহাতোর স্বাক্ষরিত পত্র।—যেহেতু আমরা নগদ মজুরী পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেই হেতু আমরা খনির কাজ ছাড়তে অসমর্থ। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়—আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ-তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়। তৃতীয়—আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।

নোটিশের প্রত্যুত্তরে সিগুকেটের একটা জবাব এল—মহারাজার সঙ্গে কোন নতুন সর্ভে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন ফুরোবে—নশো নিরানব্বই বছর পরে।

—কি রকম বুঝ মুখার্জী? অগত্যা দেখছি কৌজদারকেই ডাকতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, খাল-কাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কি না?

ফসিল

মহারাজ আস্তে আস্তে বললেন বটে, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, রুদ্ধ একটা আক্রোশ শত ফণা বিস্তার করে তাঁর মনের ভেতর ফুঁসে ফুঁসে তড়পাচ্ছে।

মুখার্জী সবিনয়ে নিবেদন করল—মন খারাপ করবেন না সরকার। আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জী বুঝেছে দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা যোগাচ্ছে কারা। সিণ্ডিকেটের দুষ্ট উৎসাহেই কুন্মি সমাজের নাচানাচি। এই গোলযোগ বিচ্ছিন্ন না করলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি—অমঙ্গলও। কিন্তু কি করা যায়!

দুলাল মাহাতোর কুঁড়ের কাছে মুখার্জী এসে দাঁড়ালো। শশব্যস্তে দুলাল বেরিয়ে এসে একটা চৌকী এনে মুখার্জীকে বসতে দিল। মাথার পাগড়ীটা খুলে মুখার্জীর পায়ের কাছে রেখে দুলালও বসলো মাটির ওপর। মুখার্জী এক এক করে তাকে সব বুঝিয়ে, শেষে বড় অভিমানে ভেঙ্গে পড়ল—একি করছো মাহাতো! দরবারের ছেলে তোমরা; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো করে বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জৎ নষ্ট করে না। সিণ্ডিকেট আজ তোমাদের ভাল খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন হুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের ঠাচাবে।

মুখার্জীর পায়ে হাত রেখে দুলাল বলল—কসম, এজেন্ট বাবা, তোমার কথা রাখব। বাপের তুল্য মহারাজা, তাঁর জন্ত আমরা জান দিতে তৈরী। তবে ঐ দরখাস্তটা একটু জলদি জলদি মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখার্জী দুলালের কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে পড়ল।—নাঃ, রোগে তো ধরেই ছিল অনেক দিন। এইবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।

ফসিল

স্নান, আহাৰ আৰু পোষাক বদলাবাব কথা মুখাজ্জীকে ভুলতে হ'ল আজ। একটোনা ডাইভ কৰে থামলো এসে সিণ্ডিকেটৰ অফিসে।

—দেখুন মিষ্টাৰ গিবসন, ৰাজা-প্ৰজা সম্পৰ্কৰ ভেতৰ দয়া কৰে হস্তক্ষেপ কৰবেন না আপনাত। আপনাদেৱ কাৰবাৰেৰ স্মৃতি স্থবিধাৰ জন্তু দৰবাৰ তো পূৰ্ণ গ্যাৰাণ্টি দিয়েছে।

গিবসন বললো—মিষ্টাৰ মুখাজ্জী, আমৰা মনিমেকাৰ নই, আমাদেৱ একটা মিশনও আছে। Wronged humanity-ৰ জন্তু আমৰা চিৰকাল লড়ে এসেছি। দৰকাৰ থাকে, আৰো লড়বো।

—সব কুশ্মি প্ৰজাদেৱ লোভ দেখিয়ে আপনাত কুলি কৰে ফেলেছেন। ষ্টেটৰ এগ্ৰিকালচাৰ তাহ'লে কি কৰে বাঁচে বলুন তো!

ঝোঁকোৰ মাথায় মুখাজ্জী তাৰ ফ্লোভেৰ আসল কাৰণটী ব্যক্ত কৰে ফেললো।

—এগ্ৰিকালচাৰ না বাঁচুক, ওয়েল্থ তো বাঁচেছে। এই অস্বীকাৰ কে কৰতে পাৰে?

—তৰ্ক ছেড়ে কো-অপাৰেশনেৰ কথা ভাবুন, মিষ্টাৰ গিবসন। কুলি ভৰ্তিৰ সময় দৰবাৰ থেকে একটু অনুমোদন কৰিয়ে নেবেন, এই মাত্ৰ। মহাৰাজাও খুসি হবেন এবং তাতে আপনাদেৱও অল্প দিকে নিশ্চয় ভাল হবে।

—সৰি, মিষ্টাৰ মুখাজ্জী! গিবসন বাঁকা হাসি হেসে চুকট ধৰালো। নিদাৰুণ বিৰক্তিতে লাল হয়ে উঠল মুখাজ্জীৰ কৰ্ণমূল। সজোৰে চেয়াৰটা ঠেলে দিয়ে সে চলে গেল অফিস ছেড়ে।

ম্যাককেনা এসে জিজ্ঞাসা কৰল—কি ব্যাপাৰ হে গিবসন?

—মুখাজ্জী, that monkey of an administrator, মুখেৰ ওপৰ শুনিয়ে দিয়েছি। কোন টাৰ্মই গ্ৰাহ কৰিনি।

ফসিল

—ঠিক করেছে। ওর ঐ ইরিগেশন স্কীমটা। খুব সাবধান, fight it at any cost. নইলে সাংঘাতিক লেবারের অভাবে পড়তে হবে। কারবার এখন expansion-এর মুখে।

—কোন চিন্তা নেই। Domesticated মাহাতো রয়েছে আমাদের হাতে। ওকে দিয়েই স্টেটের সব ডিজাইন ভুল করবো।

পরস্পর হাঙ্গ্র বিনিময় করে ম্যাককেনা বলল—মাহাতো এসে বসে আছে বোধ হয়। দেখি একবার।

অফিসের একটা নিভৃত কামরায় মাহাতোকে নিয়ে গিয়ে গিবসন বলল—এই যে দরখাস্ত তৈরী। সব কথা লেখা আছে এতে। সই করে ফেল; আজই দিল্লীর ডাকে পাঠিয়ে দি।

মাহাতোর পিঠ খাবড়ে ম্যাককেনা তাকে বিদায় দিল—ডরো মং মাহাতো, আমরা আছি। যদি ভিটে মাটি উৎখাত করে, তবে আমাদের ধাওড়া খোলা রয়েছে তোমাদের জন্তু, সব সময়। ডরো মং।

নিজের দপ্তরে বসে মুখার্জী শুধু আকাশপাতাল ভাবে। কলম ধরতে আর মন চায় না। মহারাজাকে আশ্বাস দেবার মত সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার। পরের রথের সারথ্য আর বোধ হয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু মানুষ-গুলোর মাথায় ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায়—একটা আত্মবিনাশের উৎকট কল্পনা-তাণ্ডব মজে আছে যেন। কিংবা সেই তুল করেছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান; খাস কামরায়।

অমাত্য ও ফৌজদার শুক মুখে বসে আছেন। মহারাজা কৌচের

ফসিল

চারিদিকে পায়চারী করছেন ছটফট করে। মুখাজ্জী ঢুকতেই একেবারে অগ্ন্যুদ্গার করলেন।

—নাও, এবার গদিতে থুথু ফেলে আমি চললাম। তুমিই বসো তার ওপর আর স্টেট চালিও।

হতভম্ব মুখাজ্জী অমাত্যের দিকে তাকালো। অমাত্য তার হাতে তুলে দিল এক চিঠি। পলিটিক্যাল এজেন্টের নোট।—স্টেটের ইন্টার্নাল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব আসছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্বে, আশা করি, দরবার শীঘ্রই সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু ভ্রুকুটি করেই বলল—এই সবে জ্ঞান আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী, এজেন্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সূত্র ধরে মহারাজা চীৎকার করে উঠলেন—নিশ্চয়, খুব সত্যি কথা। আমি সব জানি মুখাজ্জী। আমি অন্ধ নই।

—সব জানি? এ কি বলছেন সরকার?

—থাম সব জানি। নইলে আমার রাজ্যের ধূলো মাটি বেচে বে বেনিয়ারা পেট চালায় তাদের এত সাহস হয় কোথা থেকে! কে তাদের ভেতর ভেতর সাহস দেয়?

মহারাজা যেন দমবন্ধ করে কৌচের উপর এলিয়ে পড়লেন। একটা পেয়াদা ব্যস্তভাবে ব্যজন করে তাঁকে সুস্থ করতে লাগল। অমাত্য, ফৌজদার আর মুখাজ্জী ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে বোবা হয়ে বসে রইল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে মহারাজাই আবার কথা পাড়লেন।—ফৌজদার সাহেব, এবার আপনিই আমার ইজ্জৎ বাঁচান।

ফসিল

অমাত্য বলল—তাই হোক, কুশ্মিদের আপনি সায়েন্তা করুন ফৌজদার সাহেব আর আমি সিণ্ডিকেটকে একটা সিভিল স্মুটে ফাঁসাচ্ছি। চেষ্টা করলে কন্ট্রাক্টের মধ্যে এমন বহু ফাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জীর দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জী এর মধ্যে দেখে ফেলেছে, মহারাজার চোখ ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পেছনে কতখানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে, তা স্বভাবতঃ শশক হলেও মুখার্জী আন্দাজ করে নিল। সত্যিই তো, এ দিকটা তার এতদিন চোখে পড়েনি! তার ভুল হয়েছে। মহারাজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শাস্তভাবে তার শেষ কথাটা জানালো।—আমার ভুল হয়েছে সরকার। এবার আমায় ছুটি দিন। তবে আমায় যদি কখনো ডাকেন, আমি আসবই।

মহারাজা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না মুখার্জী, কি যে বল! তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। তবে পলিসি বদলাতেই হবে; একটু কড়া হতে হবে। ব্যাণ্ডের লাথি আর সহ্য হয় না, মুখার্জী।

শীতের মরা মেঘের মত একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন মুখার্জীর হাতপায়ের গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে। দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। শুধু বিকেল হ'লে, ত্রিচেস চড়িয়ে বয়ের কাঁধে দু'ডজন ম্যালটে চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্তটা সময় পুরো গ্যালপে স্ক্যাপা ঝড়ের মত খেলে যায়। ডাইনে বাঁয়ে বেপরোয়া আগুর-নেক হিট্ চালায়। কড় কড় করে এক একটা ম্যালটে ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে। মুখের ফেনা আর গায়ের ঘামের শ্রোতে ভিজ়ে

ফসিল

তোল হয়ে যায় কালো ওয়েলারের গলার ম্যাটিংগল আর পায়ের ফ্ল্যানেল। তবু স্কোরের নেশায় পাগল হয়ে চার্জ করে। বিপক্ষদল ভাবাচাকা খেয়ে অতি মন্থর ট্রটে ঘুরে ঘুরে আত্মরক্ষা করে। চক্রর শেষ হবার পরেও সে বিশ্রাম করার নাম করে না। ক্যান্টারে ক্যান্টারে সারা পোলো লনটাকে বিছাড়েগে পাক দিয়ে বেড়ায়। রেকাবে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে—বুক ভ'রে যেন স্পীড পান করে নেয়।

খেলা শেষে মহারাজা অহুযোগ করেন।—বড় রাফ্ খেলা খেলছ, মুখাজ্জী।

সেদিনও সন্ধ্যার আগে নিয়মিত সূর্যাস্ত হ'ল অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের আড়ালে। মহারাজা সাজগোজ করে লনে যাবার উত্থোগ করছেন। পেয়াদা একটা খবর নিয়ে এল।—চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে, এখনো ধসছে। নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুশ্মি কুলি চাপা পড়েছে।

—অতি হুসংবাদ! মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চৈঁচিয়ে উঠলেন।—এইবার দুশমন মুঠোর মধ্যে, নির্দয়ের মত পিষে ফেলতে হবে এইবার।—শীগগির ডাক অমাত্যকে।

অমাত্য এলেন, কিন্তু মরা কাতলা মাছের মত দৃষ্টি তাঁর চোখে। বললেন—দুঃসংবাদ।

—কিসের দুঃসংবাদ?

বিনা টিকিটে কুশ্মিরা লকড়ি কাটছিল। ফরেস্ট রেঞ্জার বাধা দেয়। তাতে রেঞ্জার আর গার্ডদের কুশ্মিরা মেয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তারপর?—মহারাজার চোয়াল ছুটো কড় কড় করে বেজে উঠল।

—তারপর ফৌজদার গিয়ে গুলি চালিয়েছে। ছব্বরা ব্যবহার

ফসিল

করলেই ভাল ছিল! তা না করে চালিয়েছে মুন্সেরী গাদা আর দেড় ছটাকী বুলেট। মরেছে বাইশ জন আর ঘায়েল পঞ্চাশের ওপর। ঘোড়ানিমের জঙ্কলে সব লাস এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মহারাজা বিমূঢ় হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের সামনে পলিটিকাল এজেন্টের নোটটা চকচকে সূচীমুখ বর্ষার ফলার মত ভেসে বেড়াতে লাগল।

—থবরটা কি রাষ্ট্র হয়ে গেছে?

—অন্ততঃ সিঙিকেট তো জেনে ফেলেছে।—অমাত্য উত্তর দিল।

মুখাজ্জীকে ডাকালেন মহারাজা।—এই তো ব্যাপার মুখাজ্জী। এইবার তোমার বাঙালী ইলম্ দেখাও; একটা রাস্তা বাতলাও।

একটু ভেবে নিয়ে মুখাজ্জী বলল—আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটকান।

জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কী লাঠি লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে দৌড়ল ছুলালের ঘরের দিকে।

মুখাজ্জী বলল—আমার শরীর ভাল নয় সরকার; কেমন গা বমি বমি করছে। আমি যাই।

চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে। মার্চেন্টরা দস্তুরমত ঘাবড়ে গেল। তৃতীয় সীমের ছাদটা ভাল করে টিঙ্গার করা ছিল না, তাতেই এই দুর্ঘটনা। উজ্জ্বলপাথরের কুচি আর ধুলোর সঙ্গে রসাতল থেকে যেন একটা আর্ন্তনাদ থেমে থেমে বেরিয়ে আসছে—বুম্ বুম্ বুম্। কোয়ার্টসের পিলারগুলো চাপের চোটে ভুবড়ির মত ধুলো হয়ে ফেটে পড়ছে। এরি মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পীটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

ফসিল

অগ্রাগ্রা ধাওড়া থেকে দলে দলে কুলিরা দৌড়ে আসছিল। মাঝ পথেই দারোয়ানেরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। কাজে যাও সব, কিছু হয় নি। কেউ ঘায়েল হয় নি, মরেও নি কেউ।

মার্চেন্টরা দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছে। গিবসন বলল—মাটি দিয়ে ভরাট করবাব উপায় নেই, এখনো দু’দিন ধরে ধসবে। হাজিরা বইটা পুড়িয়ে আজই নতুন একটা তৈরী করে রাখ।

ম্যাককেনা বলল—তাতে আর কি লাভ হবে? দি মহারাজার কানে পৌঁছে গেছে সব। তা ছাড়া, ছোট্ট মাহাতো; তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? কালকের সকালেই সহরের কাগজগুলো খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তারপর আসবেন একটি এনকোয়ারী কমিটি; একটা গাঙ্কিয়াইট বদমাসও বোধ হয় তার মধ্যে থাকবে। বোঝা ব্যাপার?

সে রাতে ক্লাব ঘরে আর আলো জ্বললো না! একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠল প্যালেসের একটা প্রকোষ্ঠে। আবার ডাক পড়ল মুখার্জীর।

অভূতপূর্ব দৃশ্য! মহারাজা, অমাত্য আর ফৌজদার—গিবসন, ম্যাককেনা, মুর আর প্যাটার্সন! সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেণ্টারের ঠাসাঠাসি।

সম্মিতবদনে মহারাজা মুখার্জীকে অভ্যর্থনা করলেন।—মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জী। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলল—নিশ্চয়, অনেক ক্লাম্‌জি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আগু কৰ্তব্য কি নির্ধারিত হয়ে গেছে,

ফসিল

ফোজদার তাই মুখার্জীর কানে কানে সংক্ষেপে শুনিতে দিল। নিরুত্তর মুখার্জী শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে রইল বসে।

গিবসন মুখার্জীর পিঠ ঠুকে একবার বলল—Be strong Mukherjee, it is administration !

রাত দুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার চৌদ্দ নম্বর পীটের কাছে মোটর গাড়ী আর মানুষের একটা জনতা। ফোজদারের গাড়ীর ভেতর থেকে দারোয়ানেরা কন্ডলে মোড়া ঢুলাল মাহাতোর লাসটা টেনে নামালো। ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই লাস এল আরো। ক্ষুধার্ত পীটটার মুখে শবদেহগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভুজিয়া চড়িয়ে দিলে একে একে।

শ্রাম্পোনের পাতলা নেশা আর চুরুটের বোঁয়ায় ছলছল করছিল মুখার্জীর চোখ দুটো। গাড়ীর বাম্পারের ওপর এলিয়ে বসে চৌদ্দ নম্বর পীটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল অগ্নি কথা। অনেক দিন পরের একটা কথা।

লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা ষাটঘরে জ্ঞানবুদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল! অর্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের প্রস্তরীভূত অস্থিকঙ্কাল আর ছেনি হাতুড়ি গাঁইতা—কতগুলি লোহার ক্রুড কিস্তৃত অস্ত্রশস্ত্র; যারা আকস্মিক কোন ভূবিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতকগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই!

যাযাবর

দূর বৃদ্ধগয়ার মন্দিরটা উত্তরের দিগ্বলয়ে জ্যামিতিক আঁচড়ের মত দাগা। সেখান থেকে জঙ্গলের বৃকে বৃকে একটানা গড়িয়ে সড়কটা এখানে এসে পশ্চিমে মোড় ফিরেছে। প্রথমে পরিখার মত আথ আর তিল ক্ষেতের প্রসার; তারপর সহরতলির মেটে বাড়ি—তারপর খাস সহর। মোড়ের কাছে এসে উদ্ভিদরাজ্য তার সীমা হারিয়েছে; শেষ হয়েছে তার বন্যগৌরব। এখানে আরস্ত—পুকুর, বাগান, চষাক্ষেত; মানুষের গৃহস্থালি—জনতার নমুনা।

মোড়ের দুপাশে ছড়ানো কয়েকটা দোকান আর বাংলো বাড়ি; মাঝে মাঝে শুধু ঘাসফুলে ছাওয়া মেঠো জমির টুকরো টুকরো ব্যবধান। কাছেই পাহাড়ের পায়ের কাছে পণ্টনের ছাউনির মত একটা বস্তি। সবট রাজেনবাবুদের জমিদারি। তাঁরা থাকেন সিমলায়।

আমাদের বাড়ির দুপাশে দুটো বাড়ি। পূর্বের বাড়ীটা ছোট, ন টাক। ভাড়া। আগে গালার গুদাম ছিল। পশ্চিমের বাড়ীটা বড়, ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। আগে ত্রিহুতের এক জমিদারের পোষা বাইজী থাকত। প্রায় সব বাড়ি কটাই খালি পড়ে আছে।

সন্ধ্যায় একটি আলোও জ্বলে না। ফাঁকা বাড়িগুলো সমাধির মত বিমোয়। বড় নির্জন। এ নির্জনতার চাপ ভিড়ের চেয়েও কঠোর; হাঁপিয়ে উঠতে হয়। আজ দেড় মাসের মধ্যে একবারও কেউ আসে নি।

মাঝে মাঝে শুধু দূরাগত মোটরবাসের উচ্ছ্বসিত বিলাপ জঙ্গলের লতাগুল্মে গুমরে ওঠে। টেলিগ্রাফের তারগুলো শিউরে বাজতে থাকে। ভরসা হয় এইবার বুঝি কোন প্রতিবেশী আসছেন।

ফসিল

বই পড়া বন্ধ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট বাড়িটার দিকে তাকালাম। কারা যেন এসেছে।

পিলপিল করে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এসে জামতলায় দড়িবাঁধা ছাগলটাকে ঘিরে দাঁড়াল। সব কটিরই আছুড় গা, লাল সালুর এক একটা হাফপ্যান্ট পরানো। ছয় থেকে এক বছর বয়সের ছটি হুঁপুঁপু ফরসা ফরসা মানুষ।

কারা এরা? কোন্ ধৃতরাষ্ট্র আবার এলেন আমার প্রতিবেশী হয়ে? কৌতূহল হ'ল।

সাইকেল থেকে নামলেন নরেনবাবু ওভারসিয়ার, সবে ডিউটি থেকে ফিরছেন। সোনার হাট মাথায়, পরিধানে ঢিলে হাফপ্যান্ট, পায়ে গরম হোস আর বুট, বিবর্ণ আলপাকার গলাবন্ধ কোট; তাতে বড় খিলির মত দুটো পকেট—ফুটরুল, ফিতে, ডায়েরি আর কাগজপত্রে বোঝাই। কাঁধে বলরামের লাঙ্গলের মত একটি থিয়ডোলাইট ঝোলানো!

নরেনবাবু বললেন—আস্থান ভাই আমাদের বাড়িতে। ধড়াচুড়ো ছেড়ে আলাপটা সেরে নিই।

নরেনবাবুর ছেলেমেয়েরা সামনে এসে দাঁড়াল—মটু, পিন্টু, বাঁশী, বটা, নোনা, তিহু। সব যেন অর্ডার দিয়ে তৈরী—নিখুঁত ছাঁচের স্প্রিং বসানো পুতুলের মত।

নরেনবাবু বেশ বদল করে এলেন। বুঝলাম নরেনবাবু যুবকই, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়। মুখের ওপরই শুধু রোদে ঝলসানো একটা তামাটে প্রবীণতার ছাপ পড়েছে; নইলে তিনি গৌরবর্ণ স্পুরুষ।

বললাম—নরেনদা, এই বুঝি আপনার বংশধরবাহিনী?

—এই সব নয়, আরও আছে। কোলেরটি এখন ঘুমিয়ে আছেন। নইলে ওকে দেখিয়ে দিতাম।

যাযাবর

—করছেন কি নরেনদা !

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে নরেনদা বললেন—তোমাদের এই জায়গাটা বেশ জায়গা হে। সহর থেকে দূরে বলেই বেশ। যেমন জল-বাতাস তেমনি জিনিষপত্র। যেমন সরেস তেমনি সস্তা। ধর খাঁটি দুধ, সহরে থাকলে আর টাকায় সাত সের করে পেতে হতো না। না, বেশ জায়গা ভাই।

নরেনদার মুখেই সব শুনলাম। ক'বছর ইন্ক্রিমেন্ট বন্ধ, তায় আবার কড়া ডিউটি পড়েছে। সকাল নটায় খেয়ে দেয়ে থিয়ডোলাইট কাঁধে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চার মাইল একটানা প্যাডেল চালিয়ে প্রথমে যেতে হয় চন্দ্রপুরের ক্যাম্প—রাস্তা মেটাল করা হচ্ছে। সেখানে তদ্বির শেষ করে শালবনের পথে পথে দু মাইল দক্ষিণে গিয়ে ডাকবাংলোর মেরামত কাজটা দেখেন। সেখান থেকেও দু মাইল পূবে গিয়ে লালবালু নদী। এখানে এখন জরীপ চলেছে শুধু, শীঘ্রই পুল তৈরি আরম্ভ হবে। কাজেই বাড়ি ফিরতে কখনও সন্ধ্যা, কখনও রাত হয়ে যায়।

দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নরেনদা হাঁকলেন—সামনে এসেই দিয়ে যাও না। লজ্জা করার কিছু নেই। এ হ'ল ভবানী, আমার এক ক্লাসের বন্ধু মানিকের ছোট ভাই।

দরজার আড়াল ছেড়ে নরেনদার স্ত্রী সামনে বেরিয়ে এলেন। চাকুটি দিয়ে গেলেন।

বউদিকে দেখে বিস্মিত হলাম সব চেয়ে বেশী। বহু সন্তানবতী বাঙালী মেয়ের তো এমন চেহারা থাকা উচিত নয়। ছবিতে রুশিয়ার মেয়ে-পাইলটদের চেহারার ভেতর যে নিটোল স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায় বউদি যেন তারই প্রতিচ্ছবি।

ফসিল

—যুদ্ধের দরুন জিনিষপত্র কি খুবই মাগ্গি হচ্ছে ভবানী? কিছু খবর টবর রাখ?—নরেনদা প্রশ্ন করলেন।

সে খবর আমি রাখি না, আমার দরকারও নেই। নরেনদার কিন্তু শয়নে স্বপনে এই চিন্তা—বিশ্বভুবনে কোথায় কোন্ জিনিস সস্তা। গদগদ ভাষায় বর্ণনা করলেন—জাহানাবাদের গুড়, ডালটনগঞ্জের বেগুন, মধুপুরের মুগি।—কুকুরে ছোঁয় না হে এত সস্তা।

নরেনদার বর্ণনা শুনছি। কল্পনায় তিনি সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডস্বর্গগুলিকে জড়ো করে এক মহামহিম সস্তারাজ্যের ছবি দেখছেন, যেখানে তাঁর এক মাসের মাইনে বাহান্নটি মুদ্রার বিনিময়ে একটা তালুকদারি কেনা অসম্ভব নয়।

যুদ্ধের জন্তু জিনিসপত্র মাগ্গি হচ্ছে, নরেনদা সে খবর রাখেন। নরেনদা তাই যুদ্ধের ওপর বড় চটা; সঙ্গে সঙ্গে জার্মানদের ওপরও বড় চটে গেছেন।

বললেন—এই জার্মানগুলো, বাড়িওয়ালাদের চেয়েও পাজি।

কথাটা কানে বাধল।

ক্রমে আলাপে আলাপে আরও অনেক কিছু জানলাম। গত তিন বছরে নরেনদা নিদেন পঁচিশবার বাসা বদল করেছেন। প্রত্যেক নতুন বাসাতেই প্রথম এসে কটা দিন থাকেন ভাল। অল্প দিনেই উন্মনা হয়ে পড়েন। তার পর হঠাৎ একদিন তাড়াহুড়ো করে তল্লিতল্লা নিয়ে নতুন একটা বাসায় চলে যান। বছরে আট দশবার করে গেরস্থালি গোছাতেই বউদির প্রাণান্ত হয়।

নরেনদা নিজ মুখেই বললেন—সহরে আর কেউ আমাকে ভাড়া দিতে চায় না।

—কেন বলুন তো?

যাযাবর

—কেন ? সে কি করে বলি ।

—আপনিই বা অত ঘন ঘন বাসা ছাড়েন কেন ?

—অসুবিধে হয় তাই ছাড়ি ।

—এর আগের বাসাটায় কি অসুবিধে ছিল আপনার ?

—সে আর ব'লো না । পাশের বাড়িটা থেকে দিবারাত্র বিজী
পোলাওয়ের গন্ধ আসতো ।

অবাক হয়ে বললাম—তা হ'লে এ বাসাটাও হয়তো মাসখানেক পরে
ছেড়ে যাবেন, ওই রকম গন্ধ-টন্ধর জগ্গ ।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে নরেনদা প্রতিবাদ জানানেন—না, না ; এ
বাসাটি বেশ । এ জায়গা ছাড়া চলবে না । এইবার খাটা জায়গায় এসেছি ।

একটু চুপ করে থেকে নরেনদা যেন স্বগত বলে উঠলেন—বাড়ি ভাড়া-
টাড়া কি মাহুষে দেয় ।

—কথাটা বুঝলাম না নরেনদা । তবে কি ভাড়া না দিয়ে থাকাটাই
ভদ্রলোকের পক্ষে...।

নরেনদার যেন হ'স হ'ল । অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—আহা, ভুল শুনছ
কেন । বলছি, বাড়ি ভাড়া কি মাহুষে নেয় !

মণ্টু রা সামনের ছোট মাঠটায় জামতলায় খেলছে । ডাকলাম—এই
মণ্টু অ্যাণ্ড কোম্পানি ! কাম্ আপ্ ।

যে যার বয়স আর সামর্থ্য মত সবেগে দৌড়ে এল । বললাম—সব
সার বেঁধে দাঁড়াও । ক্যাক্সারু ড্রিল শেখাব ।

ছেলেমেয়েগুলো অত্যন্ত চটপটে আর ফুর্জিবাজ । ঘণ্টাখানেক মধ্যেই
ড্রিলটা বেশ স্তূভভাবে আয়ত্ত করে নিল ।

—ওয়ান, টু, থ্রী । ড্রিল চলছে । পরিশ্রমে ঘেমে ওঠা মুখগুলো সব
জলে ভেজা সাদা ফুলের মত দেখাচ্ছে । পেশীহীন শরীরের কোমল মাংসল

ফসিল

আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠেছে রক্তের আভা। শেষে অর্ডার দিলাম—
ডিস্পার্স!

মণ্টু বলল—আবার কখন ড্রিল হবে কাকা?

—হবে এখন। এবার বাড়ী যাও।

এক ঝাঁক রাজহাঁসের মত মিঠে আওয়াজ করে মণ্টু কোম্পানি চলে
গেল। উড়ে গেল মনে হ'ল।

বারান্দায় বসে বই পড়ি। পড়া শেষ হ'লে আর কোনও কাজ থাকে
না। অস্বস্তি বোধ করি। চারিদিকে কত নয়নাভিরাম দৃশ্যবস্ত্র ছড়িয়ে
রয়েছে। দেখলেই হ'ল।

বসে বসে দেখি রাজেনবাবুদের বাগানটা। দেশী বিদেশী ফুল,
পাতাবাহারের কুঞ্জ—রঙের রূপোল্লাস। হেকার সাহেবের কেনেলটা
চোখে পড়ে—চামড়ার পেনি পরানো তাজা তাজা আলসেসিয়ান,
টেরিয়ার আর স্প্যানিয়েল। বাবুলালের মেঠাইএর দোকান—সুপীকৃত
বালুশাই, বরফি আর শোনপাপড়ি। বেলজিয়ান ক্যাথলিক গির্জাটার
হলের ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যায়—বিচিত্র রূপের পুলপিট, মূর্তি, প্রদীপ
আর কার্পেটপাতা গ্যালারি। লাল ফুলের বোবা মাথায় ক্রমচূড়াটার
তলায় বুড়ো স্মিথের পোলটি। পঁজা তুলোর মত পালকে ভরা ফাঁপানো
পুচ্ছ—ঝকঝকে পুষ্ট পুষ্ট মোরগ আর মুরগী। রোড আইল্যাণ্ড,
অরপিংটন, মিনরকা আর লেগহর্নের রঙিন ঝুঁটির শিহর, স্লাম গ্রীবা-
বিলাস আর রক্তজবার মত কানের ঝুমকোর দোলা। এ দেখবার,
উপভোগ করবার মত দৃশ্য।

কিন্তু এসব ছাড়িয়ে, সবচেয়ে নয়নাভিরাম—মানুষের কিশলয়মূর্তি
ওই নরেনবাবুর ছেলেমেয়েরা যখন একান্ত উৎসাহে জামতলায় খেলে
বেড়ায়, পলায়নপর গোসাপের পেছনে দল বেঁধে তাড়া করে, বুড়ো

যাযাবর

টাট্টু ঘোড়ার কান ধরে নির্ভীক আনন্দে বাবুই পাখীর মত ঝুলতে থাকে। তাদেরই দেখি বেশী করে।

প্রবল বর্ষা নেমেছে ক'দিন থেকে। নরেনদা বড় দেরি করে ফেরেন। মাঝে মাঝে দেখি লণ্ঠন নিয়ে মণ্টু আর বউদি বৃষ্টি আর অন্ধকারে অস্পষ্ট সড়কের দিকে তাকিয়ে নরেনদার জগু উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

আজ এখন রাত্রি বারোটা। তবুও মণ্টুরা দাঁড়িয়ে আছে। নরেনদা ফেরেন নি নিশ্চয়। উঠে যেতে হ'ল মণ্টুদের বাড়ি।

বললাম—তাই তো বউদি, রোজ যদি এমন সাংঘাতিক বর্ষা গায়ে মেখে দৌড়াদৌড়ি করেন তাহ'লে—

বউদি বললেন,—তা হ'লে কি ?

—একটা অসুখ বিস্মৃত হয়তো—

—সেদিকে ভদ্রলোক ঠিক আছেন। একটা হাঁচি কাশিও হবে না।

বললাম—তা ছাড়া এত রাত্রে জংলী পথে...

কথার মাঝখানেই বৌদি বললেন—ওই শুনুন, দয়া হয়েছে এতক্ষণে।

বৃষ্টির শব্দের মধ্যেই একটা লকড় সাইকেলের ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ শোনা গেল। নরেনদা অকস্মাৎ পৌছে গিয়ে সকলকে উদ্বেগের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিলেন।

বৃষ্টিতে ভিজ়ে সোনার হাটটা দু ইঞ্চি ফুলে গেছে। সাইকেলের কেরিয়ারে বাঁধা একবোঝা কুমড়োর ডাঁটা আর একটা লাউ। বললেন,—ছোট নদীটায় আটকে গেলাম। যা জলের তোড়! তা ছাড়া লাউটার জগু চন্দ্রপুর হয়ে একবার ঘুরে আসতে হ'ল।

ফসিল

অহুযোগ করে বললাম,—বর্ষার রাত্রে জংলী রাস্তায় অত বেপরোয়া বেড়াবেন না নরেনদা।

সাইকেলের রডে গামছা দিয়ে বাঁধা বন্ধুকটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নরেনদা বললেন—আমার এই কালো লাঠিটি ষতক্ষণ সঙ্গে ততক্ষণ সত্যিই কিস্তি পরোয়া করি না, ভবানী।

আমাকে প্রস্থানোত্তর দেখে প্রশ্ন করলেন—লাউটা কত হ'ল বল দেখি, ভবানীচন্দ্র?

রাত নিশুতি, স্বপ্ন দেখার সময়; তখন আর লাউয়ের দাম আলোচনা করবার উৎসাহ আমার নেই। চ'লে আসতে আসতে শুনলাম, নরেনদা নিজেই ব'লে যাচ্ছেন—মাত্র দু পয়সা, যাকে বলে আধ আনা।

মন্টু কোম্পানিকে ক্যান্ডারু ড্রিল শেখানো হয়ে গেছে। এর পর শেখালাম ডংকি জাম্প। এতে পিণ্টুই হ'ল ফাস্ট। চার বছরের এই ছেলেটা পাঁচ ফুট উঁচু বারান্দা থেকে সোনাচিতার বাচ্চার মত অকুতোভয়ে লাফিয়ে পড়ে সত্যিই তাক লাগিয়ে দিল।

শেখালাম হরিণ দৌড়। এতে বাঁশী মেয়েটাই ফাস্ট হ'ল।

দেখে শুনে নরেনদা একদিন বললেন—বেশ জুটেছ যা হ'ক। একে তো তাঁদড়, তারপর তুমি আবার ট্রেনিং দিয়ে ঘাগী ক'রে তুলছ।

—ভাবছেন কি? একদিন গ্রেট বেঙ্গল কলোনি বসবে এখানে। এইতো সব কাজ আরম্ভ করেছি। যা করছি পরে বুঝবেন।

—পরে কেন? এখনি খুব বুঝছি। দু সের মাংস আনলাম, চটেপুটে সব মেরে দিলে তোমার ওই মন্টু কোম্পানি।

যাযাবর

বললাম—তা, কি এমন পাপ করেছে ?

—না, পাপ করেনি ঠিকই। তবে……বোঝ না তো ভায়া !

মণ্টুদের নতুন ধরণের একটা স্মাল্ট শেখাচ্ছি। নরেনদা চেষ্টা করে
ডাক দিলেন—ওদের একবার ছেড়ে দাও তো ভবানী, দরজী এসে
ব'সে আছে !

মণ্টুদের সঙ্গে নিয়েই গেলাম। নরেনদা বললেন—দেখছ ?

দেখলাম। ভালুকের না কিসের রোঁয়ার একটা লম্বা চওড়া পুরু
কম্বল। যেমন খসখসে তেমনি ভারী।

—কি হবে এটা, জিজ্ঞাসা করলাম।

—এটা থেকে সব হবে। মণ্টুদের ছুটি ওভারকোট হবে। তা
ছাড়া আমারও ফতুয়ার মত একটা কিছূ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

বললাম—কি যাচ্ছেতাই করছেন নরেনদা। ছেলেগুলোর গায়ের
ছাল আর থাকবে না।

—খুব থাকবে। বোঝ না তো ভায়া !

নরেনদা দরজীকে কাজের নির্দেশ দিতে লেগে গেলেন।

শীত এসে পড়েছে। পশ্চিমের বড় বাড়ীটাতে কারা এসেছে।

আলাপ হ'ল। হাওয়া বদলের জন্ম এসেছেন বৃন্দাবনবাবু, তাঁর মা
আর তার ছেলে পৈঁচো পিণ্টুদের বয়সী। বৃন্দাবনবাবুর ডিসপেনসিয়া,
পৈঁচোর রিকট। বৃন্দাবনবাবুর মা বিপ্লাস্বী, মেদভারে মস্তুর।

বৃন্দাবনবাবু বললেন—তুমি মানিকের ভাই ? তা আগে বলতে
হয়। তোমাকে তো আত্মীয় বলেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।
যাক……তেলটা আর ঘিটা, এ যেন খাটি হয় ভবানী। এই বন্দোবস্তটা
ক'রে দাও। পয়সা লাগুক কিন্তু জিনিষ ভাল হওয়া চাই।

ফসিল

মাসীমা অর্থাৎ বৃন্দাবনবাবুর মা বললেন—একটা ভাল গয়লা ঠিক ক’রে দাও বাবা। বাড়িতে দুয়ে দিয়ে যাবে। এবেলা পাঁচ সের ওবেলা তিন সের। একাদশীর দিন আরও দু সের।

—পয়সার জ্ঞান ভাবি না ভবানী। বাজিয়ে টাকা দেব, বাজিয়ে জিনিষ নেব। তোমার বাবাও তো শুনেছি বেশ কিছু রেখে গেছেন। হ্যাঁ, তোমার কাকাই বোধ হয়, একবার ধার চাইতে এসেছিলেন। আর……।

বৃন্দাবনদা তুবাড়ির মত কথা ছড়িয়ে চললেন; তার মধ্যে মাত্রার বালাই নেই। উত্তরের জ্ঞান মুহূর্তেকও অপেক্ষা না ক’রে আরম্ভ করলেন,—যাক, দুটো ভাল চাকর, একটা ভাল ধোপা; এ যেন কালকের মধ্যেই যোগাড় হয়ে যায় ভবানী।

মাসীমা বললেন—একটা ভাল ডাক্তারও ঠিক ক’রে দিতে হয় বাবা পেঁচোর জন্তে। রোজ একবার এসে দেখে যাবে।

বড় বাড়ির মর্জি ফরমাস খেটে চলেছি। মন্টুদের সঙ্গে ক’দিন দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না। নরেনদার দেখা পাওয়া তো আরও দুষ্কর। কিন্তু জানি ওরা সব ভাল আছে। ভাল থাকারটাই ওদের নিয়ম।

বউদির কোলের ছেলেটার এতদিনে ঠ্যাঙে জোর হয়েছে; ট’লে ট’লে হাঁটে, জোরে হামাও দেয়। মন্টুরা ওর নাম দিয়েছে—টাইগার।

মাঝে মাঝে রাত্রে দেখতে পাই, মন্টুরা প্রদীপ জ্বলে বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে পড়তে বসে। টাইগার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে পড়ার ব্যাঘাত করে—প্রদীপ উল্টে দেয়। নরেনদা ব’সে ব’সে টাইগারকে সকল নষ্টামিতে উৎসাহ দেন! বউদি এসে প্রতিবাদ করেন!

তবু স্ত্রের কথা। ভদ্রলোক বছর খানেকের ওপর এখানে টিকে

যাযাবর

গেছেন। শোনা যায়, জায়গার গুণে ক্ষ্যাপা হাতী ঘুমিয়ে পড়ে।
এ তো মানুষ।

বড় বাড়ির চাকর রামতুলালকে আড়ালে পেয়ে একদিন জিজ্ঞাসা
করলাম—ই্যা রে, আট সের দুধ রোজ কে খায় বল তো? সবাই
তো রুগী।

—বুড়ীমা খায়।

—বাজে বকিস না, ঠিক ঠিক বল।

ঝুট কেন বলব বাবু। আমি নিজে দেখিয়েছে—একাদশীকা
রোজ এক কড়াহি রসগোল্লা বুড়ীমা একা খেয়ে ফেলিয়েছেন।

মন্টুদের পুরো দলটি নিয়ে একদিন চড়াও করলাম মাসিমার বাড়ি।
মাসিমা ছাঁচ থেকে খুলে থালায় সন্দেশ সাজাচ্ছেন। একটা কড়াতে
রসগোল্লা ভাসছে, আর একটা জামবাটিতে কানায় কানায় ভরা ক্ষীর।

—এরা আবার কারা? মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন।

—এরা? এরা পৃথিবীর ছেলে। এদের সন্দেশ দিন।

মাসীমা খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন—আহা, বাপ
মা নেই বুঝি?

খাসা বাপ মা রয়েছে, বলেন কি? সন্দেশ দিন।

—কি যে ছেলেমানুষি কর ভবানী! কোন্ ঢঙে কথা বল বুঝতে
পারি না বাবা। বলি, কাদের ছেলে এরা?

—নরেনবাবুর। ওই পূবের বাড়িতে যাঁরা থাকেন।

—তা, বউটির তো বড় কষ্ট।

—কষ্ট আবার কিসের?

—কষ্ট নয়? এতগুলো কুচোকাচা সামলানো; মানুষ করা।

—মানুষকে আবার মানুষ কি করবে?

ফসিল

—যা বোঝ না তা নিয়ে কাব্যি ক'রো না বাবা। এক পেঁচাকে নিয়েই বুঝেছি কত বড় দায় ভগবান ঠেলে দেছেন মাথার ওপর!

পেঁচোর কথা উঠতেই নজরে পড়ল—ঘরের এক কোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পেঁচো।

মানুষের চেহারার এত বড় ট্রাজেডি সহজে চোখে পড়ে না। জিরজিরে হাত পা বুড়ো বাতুড়ের মত কেশবিরল মাথাটা। চার বছরের একরত্তি এই ছেলেটার ধড়ে কে যেন একটা বুনো সংসারীর মুখোশ বসিয়ে দিয়েছে। মায়া হ'ল দেখে। আহা, রোগেই ছেলেটার এহেন দশা করে ছেড়েছে।

কিন্তু পেঁচো এগিয়ে আসছে। হাতে একটা বাঁশের লাঠি। তার উদ্দেশ্যটা খুবই স্পষ্ট; মন্টুদের খানিকটা খোঁচাতে হবে এই তার মনের বাসনা।

মন্টু পিণ্টু সকলে সভয়ে স'রে এসে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়াল। বললে—কাকা, মারছে।

মাসীমা কটুকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—কি মিথ্যুক রে বাবা, এই ছেলেগুলো! মারছে? কোথায় মেরেছে?

তার পর স্তম্ভচূর আদর-রসে গলা ভিজিয়ে নিয়ে পেঁচোর উদ্দেশ্যে বললেন—যাও কাগ মেরে এস দাও। যাও, এদের মারতে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। পেঁচোর করোণেটেড পাঞ্জরগুলো কেঁপে উঠলো দু তিন বার। তারপরেই একটা চীৎকার ছেড়ে লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে কেশবিরল মাথাটা নিশ্চলভাবে অবিশ্রান্ত মেঝের উপর ঝুঁকে যেতে লাগল।

—যা ভেবেছিলাম তাই। তোমরা একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়লে না। এখন সামলাতে গিয়ে প্রাণটা আমার ষাক্। মাসীমা রাগ ক'রে বলে চললেন।

যাযাবর

কান্না শুনে বৃন্দাবনদা এলেন। পেঁচাকে বিস্তর আদর অহুন্নয় ক'রে
সুস্থ ক'রে তুললেন। বাঁশের লাঠিটা তুলে নিয়ে একবার মণ্টুর একবার
পিণ্টুর পেটে ঠেঁকিয়ে পেঁচাকে বোঝালেন—হেই মেরেছি। খুব মেরেছি।
এইবার চুপ! ই্যা এই যে পাঁচুবাবু চুপ করেছে। পেঁচো বড় ভাল।

পেঁচো শান্ত হ'ল।

—কাদের ছেলেপিলে হে ভবানী? বৃন্দাবনদা জিজ্ঞাসা করলেন।

—নরেনবাবু ওভারসিয়ারের।

—এতগুলো! কত মাইনে পায় ভদ্রলোক? বৃন্দাবনদা মাত্রা-
তিরিক্ত বিষয়ে কপাল কুঁচকে ফেললেন। এর কথাবার্তার রুচতায়
সত্যিই রাগ হচ্ছিল। বললাম—মাইনে কমই পায়। বাহান্ন টাকা।
তাতে হয়েছে কি?

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বৃন্দাবনদা বললেন—গুলি করা উচিত!

—কাকে?

একটু খতমত খেয়েই যেন বৃন্দাবনদা উত্তর দিলেন—আহা, এদের
নয়। এদের নয়। ওই নির্কোষ লোকগুলোকে, প্রকৃত অপরাধী যারা।

আবার খানিকক্ষণ চিন্তাক্লিষ্ট থেকে হঠাৎ মণ্টুদের দিকে সঙ্গিনের
মত ছুঁচলো তর্জনীটা তুলে বললেন—এই যে কটা জীব……।

মণ্টু রা সকলেই একটু চমকে উঠল।

……জানি এরা নির্দোষ, এরা পবিত্র। কিন্তু তবু, ছি ছি, সমাজকে
এভাবে ট্যান্স করা……।

কোমর-ভাঙা সাপের শানিত হিংস্রক দৃষ্টির মত বৃন্দাবনদার চোখ
একবার চিকচিক করে উঠল। বললেন—এর একমাত্র উপায় কি জান? এই
লোকগুলোর এই বাড়াবাড়ি, এত বাপ হবার সখ—অস্ত্রোপচারে
একেবারে নির্মূল করে দেওয়া। বৃন্দাবনদার বক্তব্য শেষ হ'ল।

ফসিল

আস্তে আস্তে আবার পুরাণো প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম—এইবার ছেলেদের একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিন মাসীমা।

—থাম বাবা ভবানী। পেঁচোর কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। কাল না হয় আর এক সময় এদের নিয়ে এসো।

মণ্টুরা অনেকক্ষণ থেকেই বাড়ি যাবার জন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। বললাম—দাঁড়াও, দাঁড়াও, লজ্জা কেন? দিদিমার বাড়ী সন্দেশ টন্দেশ থাও, তারপর যোয়ো।

মাসীমা বললেন—হাঁ, অনেকক্ষণ তো হ'ল। ওদের মা হয়তো ভাবছে!

—না, মা ভাববে কেন? ভাবনার কি আছে।

—কেমন মা রে বাপু! মাসীমা যেমন বিরক্ত তেমনি হতাশ হয়ে পড়লেন।

বৃন্দাবনদাকে ইংরাজীতে বললাম—পেঁচোকে একটু স্থানান্তরে নিয়ে যান। মাসীমা ছেলেদের মিষ্টিমুখ করাবেন!

এতখানি অধ্যাত্মসাধনার পর মাসীমা অগত্যা বিচলিত হলেন। ভাঁড়ার থেকে শালপাতার ঠোঙায় গোটাকয়েক বাতাসা নিয়ে বললেন—কই গো খোকাখুকীরা, হাত পাত দেখি সব একে একে।

দেখলাম, মণ্টু পিণ্টু বাঁশী প্রত্যেকের হাত কাঁপছে। শঙ্কিত চোখে বার বার তাকাচ্ছে আমার দিকে। তিহু কেঁদেই ফেলল—বাড়ি চল কাকা। মাসীমা তেতে উঠলেন—বড় বেয়াড়া নরেনবাবু না কার এই ছেলেগুলো। নেবে কি না বলে দাও ভবানী, আমি আর তপিস্তে করতে পারবো না বাবা।

হঠাৎ বাতাসার ঠোঙা হাতে মাসীমা তাঁর বিপুল দেহভার নিয়ে থপ থপ ক'রে চোরের মত দৌড়ে স'রে গেলেন। চমকে ফিরে

যাযাবর

দেখলাম—অদূরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পৌঁচো। এই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ। পৌঁচোর চোখ থেকে বিষের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে যেন। আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। ব্যস্ত হয়ে মণ্টুদের বললাম—আর নয়, চল এবার যাই।

সমস্ত রাত্রিটা ঘুমোবার সময় পাইনি একরকম। নরেনদার সঙ্গে ধাই ডাকতে বসি বসি ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কাল রাত্রে মণ্টু-ব্রাদারহুডের একটি নতুন সভা ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

নরেনদা নিজেই রান্নাবান্না করে আজকের সকালেও বেরিয়ে গেলেন সাইকেল নিয়ে—ডিউটি দিতে। মণ্টুরা অগ্নি দিনের মত ড্রিল করতে এবেলা আর এল না। ওদের উৎসবে পেয়েছে আজ। কেউ বাসন মাজছে, কেউ দিচ্ছে ঘর ঝাঁট, কেউ বা উত্তুন জেলে জল গরম করতে ব্যস্ত।

আহার শেষে একটা আরাম-নিদ্রার উদ্যোগ করছি। রামচুলায় এসে জানালো—মাসীমা ডাকছেন, এখুনি যেতে হবে। একটুও দেরি করলে চলবে না। পৌঁচোর অবস্থা খারাপ।

হস্তদন্ত হয়ে পৌঁছলাম বড়বাড়ি। মাসীমা অবসন্নভাবে একটা পাখা হাতে নিয়ে বসে আছেন। প্রায় কঁাদ কঁাদ হয়ে বললেন—বাবা ভবানী, একবার উঠানে এস আমার সঙ্গে।

আশঙ্কায় বুকটা ছমছম করে উঠল। নিদারুণ কিছু ঘটে যায়নি তো।

—উঠানে? কেন মাসীমা?

—পৌঁচো হেগেছে। কি সাংঘাতিক, দেখবে এস। সবুজ সবুজ ফেনা আর কালো ছিবড়ের মত মল। এখুনি ডাক্তারকে খবর দিতে হয়, ভবানী।

একটা গ্লাকারের তোড় প্রায় গলা ঠেলে এল। মুখে ক্রমাল চাপা

ফসিল

দিয়ে বললাম—মাপ করবেন মাসীমা। রামজুলারকে পাঠিয়ে দিন। আজ আর আমার সামর্থ্যে কুলোবে না কোন কাজ।

চলে এলাম। এইখানেই বড়বাড়ির সঙ্গে সকল সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। আর ডাক পড়েনি কখনও।

সড়ক ধরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর গিয়েছি। নরেনদা সাইকেলের আওয়াজে পথের নিশ্চিন্ত কাঠবিড়ালীগুলোকে সচকিত করে আসছেন।

—থামুন নরেনদা, কোথায় থাকেন আজকাল?

নরেনদা থামলেন। কেরিয়ারে বাঁধা একটা পুঁটলি আর হ্যাণ্ডলে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা পেতলের ঘটি, তার মুখটা শালপাতা দিয়ে মোড়া।

—কেরিয়ারে কি নরেনদা?

—আতপ চাল। তের পরসায় ছু সের।

—ঘটিতে।

—তুধ।

—খুব রাবড়ি টাবড়ি চালাচ্ছেন বুঝি আজকাল?

—না হে না। রাবড়ি না ছুঃস্বপ্ন! গয়লা ব্যাটা তুধের দর চড়িয়েছে। বলে, টাকায় চার সেরের বেশী দেবে না। আমিও তেমনি, শ্রেফ বন্ধ করে দিয়েছি। মাঝে মাঝে গাঁয়ে দেহাতে সন্তায় এক আধ সের এই রকম পেয়ে যাই, বাস্।

এ উত্তরের জন্ত তৈরী ছিলাম না। এত অকপটে, অক্লেশে যে সোজা কথাগুলো বলে গেলেন নরেনদা তার প্রত্যুত্তর দেওয়া আর সম্ভব হ'ল না।

—যা যুদ্ধের বাজার পড়েছে! বিড় বিড় করে নিজের মনে বকতে বকতে নরেনদা উঠে চলে গেলেন।

যাযাবর

এমন কিছু ঘটেনি। তবু মনের মধ্যে সর্বদা একটা মেঘলা গুমোটের ভার অনুভব করি। সাইকেলে দুধের ঘটি ঝোলানো নরেনদার ঘস্মাক্ত চেহারাটা থেকে থেকে মনে পড়ে। মনে পড়ে বউদির কোলে ঘুমন্ত পায়রার মত পুচকে খোকাটার কথা। মনে পড়ে স্বাস্থ্যে গড়া লাটিমের মত মণ্টু কোম্পানির কথা।

নরেনদা একটা চটের ছালাকে পাট করে সাইকেলের কেয়িয়ারে বাধছেন, ডিউটিতে বার হবার উদ্যোগ করছেন। বললেন—চন্দ্রপুরের সাঁওতালদের কাছে মণ খানেক সন্ধান চাল আছে। আজ বাগাতে হবে সস্তায়। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখনও গিয়েছ কি ভবানী—চন্দ্রপুর?

—না।

—যেয়ো একবার, ভারী সুন্দর জায়গাটা।

যেন একটা নতুন জগতের বার্তা শোনাচ্ছেন, এমনভাবে ব'লে চললেন—সুন্দর জায়গা। পাশের দেহাতে কি না পাওয়া যায়! আর কত সস্তা! ছাগলের দুধই পাওয়া যায় দিনের পাঁচেক আর তাও মাত্র পাঁচ আনায়।……কাছেই একটা বড় বিল—পানিকলে ঠাসা। বাঘা বাঘা মাগুর সব কিলবিল করছে। ধ'রে আনলেই হ'ল।…… অড়হরের তো জঙ্গলই প'ড়ে রয়েছে। ওর আর চাষ করতে হয় না। এক ডাল খেতে খেতেই পরমাণু ফুরিয়ে যায়।

নরেনদা চ'লে গেলেন।

প্রায়ই আজকাল দেখা সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু প্রথম দিনের দেখা সেই উৎফুল্ল মানুষটিকে আর পাই না। সেই প্রাক্কমানবীয় শ্রমোৎসাহ যেন কতকটা টিমে হয়ে এসেছে।

মণ্টু কোম্পানিকে নিয়েও আজকাল অতটা হটোপাটি করতে নন

ফসিল

চায় না। বড় জোর একটা আবৃত্তি, একটা শেয়ালের স্কুল বা এই রকম কোনও একটা কুঁড়ে খেলার মহড়া দিয়ে ছেড়ে দিই।

হয় আমার চোখের ভুল, নয় ব্যাপারটা সত্যি। মণ্টুদের বেশ রোগা রোগা দেখছি।

একদিন সন্ধ্যায় খবর পেলাম—নোনার জ্বর হয়েছে।

ব'সে ব'সে অনেক কিছু ভাবলাম। ঘটনাগুলো সব কেমন যেন একে একে ছন্দ হারিয়ে চলেছে। আমার গ্রেট বেঙ্গল কলোনির মাথার ওপর ক্রমেই জমে উঠেছে বড় নোংরা অভিশাপের ঝড়।

নরেনদার ঘরে ঢুকতেই কানে এল—মালিশ, স্নেহ মালিশ ক'রে যাও।

বুকে কফ ঘড়ঘড় করছে, জ্বরে চোখ মুখ লালচে; নোনা চুপ করে শুয়ে আছে। বউদি নোনার বুকে কি একটা মালিশ করছেন।

মাঝখানে প'ড়ে আপত্তি করলাম—ডাক্তার ডাকা উচিত।

নরেনদা বললেন—শোন কথা। হয়েছে তো সর্দিজ্বর, এইবার ডাক্তার এসে নিউমোনিয়া ক'রে দিক।

বললাম—ডাক্তার ডাকছি, পয়সা লাগবে না।

নরেনদার চোখ দুটো জলে উঠল দপ ক'রে। কঠোর স্লেষাক্ত স্বরে মুখ বাঁকিয়ে বললেন—তুমি কাঁচা নিমপাতা খাবে? পয়সা লাগবে না।

দ'মে গিয়ে বললাম—আচ্ছা, আসি এবার।

নরেনদাও সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত ভাষায় সমীহ ক'রে বললেন—হাঁ এস। তবে রাগ ক'রো না। জানই তো লোকে সারে নিজের গায়ের জোরে আর নাম হয় ডাক্তারের।

ক'দিনের মধ্যেই বুঝলাম, নরেনদার কথাটাই সত্য হয়েছে। নোনা সেরে উঠেছে। নরেনদা মাঝে মাঝে গান গাইছেন।

যাযাবর

মনটা খুশী ছিল সেদিন—মণ্টুদের নিয়ে হৈ চৈ করার উৎসাহটা আবার পেয়ে বসল।

হাঁক দিলাম—এই পিণ্টু। স্ট্যাণ্ড আপ্। রেলিং-এর ওপর দাঁড়াও। জাম্প্।

পিণ্টু একবার হাঁটু মুড়ে লাফাতে গিয়েই আবার তাড়াতাড়ি সামলে নিল।

হাঁকলাম—জাম্প্ ডংকি, জাম্প্।

পিণ্টু আবার দম টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ পায়তড়া করল।

হাঁটু দুটো বেতলা কেঁপে উঠল বার কয়েক। তারপর লজ্জিত হয়ে অপ্রস্তুতভাবে চুপ ক'রে দোষীর মত তাকিয়ে রইল।

রাগ চ'ড়ে গেল মাথায়—এ কি হচ্ছে পিণ্টু! কাওয়ার্ড!—জাম্প্!

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পিণ্টু। বুকটা ওর টিপ টিপ করে উঠছে পড়ছে। ছোট ভুরু দুটোর ওপর ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শান্ত হয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বললাম—আচ্ছা, নেমে এস। লাফাতে হবে না। বাড়ি যাও সব।

মনে পড়েছে। আমাদের সাঁওতাল চাকরটা কঁাদতে কঁাদতে বা বলছিল—ক'দিনের জরে ম'রে গেছে ওর ছোট্ট একটি ছেলে। ডাইনী আছে ওদের গাঁয়ে। তাকে চিনেও ফেলেছে সে; একদিন এর শোধ তুলবে।

আরণ্য বর্ষরতায় লালিত সাঁওতাল ছেলের সংশয়বিকার আজ আমারও যুক্তি রুচি শিক্ষা সব কিছুকে অন্ধকারের মত জড়িয়ে ধরছে পাকে পাকে। কে জানে, কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়।

বড়বাড়ির খবর অনেকদিন রাখিনি। আমার প্রয়োজন সেখানে অনেক দিনই মিটে গেছে। তবে বৃন্দাবনবাবুরা এখন আর একা নন।

ফসিল

একজনের বদলে আজ একটা সহরই তাঁর প্রতিবেশিত্ব করছে। রোজ সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় দস্তুরমত জনসমাগম হয়। সহরের সম্ভ্রান্তরাই আসেন—বাইরে দাঁড়ানো গাড়িগুলি থেকেই তার পরিচয় পাই। প্রায়ই নিমন্ত্রিতদের ভূরিভোজনের আনন্দ কোলাহল কানে ভেসে আসে।

—দাঁড়া রামজুলার। কথা আছে।

রামজুলার ঘাড় থেকে চিনির বস্তাটা নামিয়ে দাঁড়াল।

—কবে যাচ্ছে রে তোর বাবুরা?

—এখন এক বছর থাকবেন।

—এক বছর! কেন, কি হ'ল আবার?

—এখন যাবেন কেন? বাবুকা তনজুরুস্তি হচ্ছে, আজকাল আঙা হজম করছেন। পেঞ্চোভি মোটায় যাচ্ছে দিনকে দিন!

একটা চিঠি পেলাম। বাড়িওয়ালা রাজেনবাবু সিমলা থেকে আমাকেই লিখেছেন—আমাদের বড়বাড়ির ভাড়াটে বৃন্দাবনবাবুকে আমার নমস্কার জানাবে। যথাসাধ্য ওদের স্বথ স্ববিধার দিকে একটু নজর রাখবে। হাজার হ'ক, প্রতিবেশী।

...আর আমাদের ছোট বাড়ির ভাড়াটে নরেন ওভারসিয়ার নামে লোকটা সাত মাস ভাড়া বাকী ফেলেছে। চিঠি দিয়ে কোনও উত্তর পাই না। মুরারী উকিলকে দিয়ে যথাশীঘ্র একটা রেন্ট-সুট ফাইল ক'রে দিও। বেশী বদমাইসি করে তো ইনজাংশনের অর্ডার নিও। তোমার ওপর সব ভার দিলাম।

অনেক দিন পরে আবার পুরনো দিনের নির্জনতাকেই খুঁজছি সাধ ক'রে। পাশের এই দুটো বাড়িই খালি হয়ে যাক এই মুহূর্তে—এই ধুমায়িত আবহাওয়া একটু পরিচ্ছন্ন হ'ক।

যাযাবর

মনের যত চাপা অভিমান টেলে ডায়রিতে লিখে রাখলাম—আমার পরম হারানোর দিন বোধ হয় ঘনিয়ে আসছে। একদিনের পাওয়া, এতদিনের পাওনা, গ্রেট বেঙ্গল কলোনির স্বপ্ন—সবই শুধু একটা ফাঁকি রেখে সরে পড়বে—ভাদ্র মেঘের চটল ছায়াবর মত।

কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল, পৃথিবীর বাতাসে শব্দ স্পন্দন যেন থেমে গেছে—নিরেট একটা স্তব্ধতা। বড়ফড় ক'রে উঠে জানালা খুলে তাকালাম।

হাঁ সত্যি। কার্নিভালের তান্ত্র আসরের মত প'ড়ে আছে জনশূন্য ছোট বাড়িটা। কোন মমতার চিহ্ন বাগাই নেই সেখানে। ছোটো গরু এরই মধ্যে বারান্দায় চ'ড়ে জাবর কাটছে। একটা কুকুর কুনুপ লাগানো দরজার অপরিসর ফাঁকটা দিয়ে মাথা গলিয়ে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

—পালিয়েছে লোকটা। বুনো, বেদে, চোর……।

লাঠিটা নয়, টেবিলের উপর থেকে রাজেনবাবুর চিঠিটা ছেঁ। মেরে তুলে নিলাম। ওদের আটক করতেই হবে, পালাতে দেওয়া চলবে না। দৌড়ে এসে দাঁড়ালাম সড়কের ওপর। কতদূর গেছে ওরা?

বেশী দূর নয়—কদমের সারিটা পর্যন্ত। চন্দ্রপুরের সড়ক ধরে মালমাত্র বোঝাই গরুর গাড়িটা চলেছে আগে আগে। পেছনের গাড়িতে বউদি আর মণ্টু রা। পাশে আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে মাথায় সোলার হ্যাট চাপিয়ে নরেনদা চলেছেন।

পুরনো ইতিহাসের একটা ছেঁড়া পাতা উড়ে গেল সম্মুখে—নূতন ভূগভূমির স্বপ্ন দুচোখে, শস্যকণা প্রলুদ্ধ যাযাবরের দিকে দিকে পাড়ি। পেছনের যত পরিচয় দুহাতে মুছে ফেলে, যত বক্ষ্যা মাটির ঢেলা অবহেলায় ছুপায়ে মাড়িয়ে ওরা একদিন চলে যায়। ওরা বাঁধা পড়ে না কোথাও।

শক থেরাপী

ওয়াটকিনস্ মূরের ছেলে বেসিল মূর পাগল।

বুড়ো ওয়াটকিনস্ মূর ইণ্ডিয়ান আমিতে অফিসার ছিলেন। অবসর নিয়ে এখন থাকেন ছোটনাগপুরের এই সহরটাতে। খাস সহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা পাহাড়ে টিবির ওপর ইউকালিপটাসে ঘেরা তাঁর বাংলো। নাম—দি রিট্রিট।

এই খাপছাড়া জায়গাটা বুড়ো মূরের এত পছন্দ কেন? এ সম্বন্ধে বুড়োর একটা বাঁধা বক্তব্য ছিল, যা তিনি এ পর্যন্ত সহস্রাধিক দেশী বিদেশী ভদ্রলোককে শুনিয়েছেন।

—এ বাংলাটা ঠিক আমাদের শায়ারের কাসেলের মত। আমরা ইয়র্কশায়ারের লোক, যারা গ্যালাস্ট্রির জন্ম বিখ্যাত। তা ছাড়া আমরা—দি মূরস্ অব ইয়র্কশায়ার—আমরা হ'লাম নীলরক্ত ব্রিটন। আজ দুশো বছর ধ'রে আমরা ওই একই গ্র্যাণ্ড ওল্ড কাসেলে বাস করে আসছি। আজ শিভাল্লরীর টর্চ নিভে গেছে, তাই আমরা গরীব। যত জেলে হয়েছে অফিসার, ডিঙ্গি নিয়ে বোম্বটে করাই নাকি বীরত্ব! ওদেরই মাইনে বেশী।

...কিন্তু ও-কাজ আমাদের ধাতে নয় না। অকৃতজ্ঞরা আজ ভুলে গেছে যে, ফরাসী ব্যারনদের হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে আমরা একদিন ডেলের মাটিতে সার দিয়েছিলাম। আজ আমাদেরই মাইনে কম।

...বিদেশ, এমন কি, কলোনিগুলোকেও আমি ঘৃণা করি। শায়ার আমাকে ডাকছে। শেষ বয়সে আমি পেতে চাই সে বাতাস, যে বাতাসে নাইট টেম্পলারদের, আমার বাইশ পুরুষের নিশ্বাস মিশে আছে। এবার দেশে যাব।

শক থেরাপী

...কিন্তু বড় কম পেম্পন। আমার ছেলে বেসিল আসছে। তাকে আমি সার্ভিসে একটা কাজে লাগিয়ে দিয়ে তারপর। যাবার আগে ওর বিয়েটাও দেখে যেতে চাই।

সেই বেসিল এসেছে। একটা সাড়া পড়ে গেছে বিলিভী গিন্সী মহলে। মিসেস ওয়ান্টার মুসৌরীতে মেয়ের কাছে তার করলেন। স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এল ক্লারা। কার্সিয়ং থেকে মিসেস স্টোকস্ আনালেন সিলভিকে। উটি থেকে চলে এল মিসেস লেনের মেয়ে আনা।

সহরের সাধারণ লোকেরাও চিনে ফেললো বেসিলকে। বড় ভালো হকি খেলোয়াড়। এবারে টুর্নামেন্টে ওই একা যজ্ঞের ঘোড়ার মত দশদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একা এগার জনের খেলা খেলে দিল। তাই এবার ট্রফি পেল একাদশ প্যাছার—য়ুরোপীয়ান দল।

কিন্তু এ ক'দিনের মধ্যেই বুড়ো মূর দশবার রুমালে চোখের জল মুছেছেন। রাত জেগে প্রার্থনা করেছেন দুদিন।—আমার সম্মান, আমার রুটী, এই বয়সে, ও লর্ড—যেন ধুলো হয়ে না যায়।

বুড়ো মূর বুঝেছে বেসিল পাগল। এ কথাটা এখনও অগত্যা রাষ্ট্র হয়নি।

প্রাতঃস্থানের পর পাটপ ধরিয়ে বাগানে পায়চারী করতে বেরিয়ে এলেন বুড়ো মূর। একটা দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে থমকে রইলেন কিছুক্ষণ। বেসিল বাংলোর মেথরাণীকে সসম্মানে একটা সিগারেট সাধছে।

রাগে রাজমাক বাহিনীর ত্রিশ বছরের ঝাঙ্ক খুনিয়ার অফিসার ওয়াটকিনস্ মূরের চোখে সকাল বেলার সূর্য্য নিভে এল। দিশেহারা হয়ে ছবার বেণ্ট হাতড়ে রিভলবার খুঁজলেন, একবার ফুলের টবটা তুললেন, তারপর সামলে নিয়ে গলা দিয়েই তোপ দাগলেন—বেসিল!

বেসিল এগিয়ে এল হাসিমুখে—গুডমর্নিং, ড্যাড।

ফসিল

—এস আমার সঙ্গে ।

বুড়ো মূর বেসিলকে যেন বধ্যভূমির দিকে নিয়ে গেলেন । কিন্তু এলেন ডুইংক্রমে । বেসিলকে একটা কৌচের ওপর বসিয়ে প্রশ্ন করলেন

—তুমি জান যে তুমি পাগল ?

—না । তোমার অস্থখ করেছে ড্যাড । চোখ বড় লাল !

—চুপ ! তুমি ভাল হতে চাও ?

—নিশ্চয় ।

—তবে এসব গর্হিত কাজ খবরদার করবে না । আজ সন্ধ্যায় ওয়ান্টারের বাড়ীতে চায়ে উপস্থিত থাকবে ।

—আচ্ছা ।

—খাটি ব্রিটনের মত ব্যবহার করবে ।

—নিশ্চয় !

ওয়ান্টারের বাড়ীতে চায়ের আসরে নিমন্ত্রিতেরা বসে আছে । স্টোকস্ আর লেন গিন্নীও আছেন । মোহিনী সাজে সেজে বসে আছে ক্লারা, আনা ও সিলভি । প্রধান অতিথি বেসিল এখনো আসেনি । কিন্তু সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ ।

বুড়ো মূর প্রমাদ গণলেন মনে মনে । অপরাধীর মত বললেন—
আমি তো তাকে দেখে এসেছি পার্টিতে আসবার জন্তে পোষাক চড়াচ্ছে ।
বোধ হয় এসে পড়বে এখনি ।

নীল সার্ট, লাল কোট আর হলদে ট্রাউজার পরে, একটা মাউথ অর্গান বাজাতে বাজাতে আসরে অভ্যাদিত হ'ল বেসিল । মরমে মরে গিয়ে বুড়ো মূর অশ্রুট আর্ন্তনাদ করলেন—হেভেনস্ !

ক্লারা, আনা ও সিলভি আতঙ্কে শিউরে চেয়ার ছেড়ে বুড়ীদের গা

শক থেরাপী

ঘেসে দাঁড়ালো। বুড়ো মূর বুকে সাহস বেঁধে বললেন,—তুমি ভুল করেছ বেসিল, এ ফ্যান্সি ড্রেসের আসর নয়।

মিসেস্ ওয়ান্টার—এটা ক্লাউনদের ক্লাব নয়।

মিসেস্ স্টোকস্—এটা জিপসিদের আড্ডা নয়।

মিসেস্ লেন—এটা সোসাইটি।

সকলের এই আপত্তি, বিক্ষোভ আর প্রশ্নের উত্তরে গালভরা হাসি হেসে বেসিল জানালো—খুব ক্ষিদে পেয়েছে না ?

ক্লারা, আনা ও সিলভি একসঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেল। উঁচু হিল জুতোর দ্রুত ঠকঠকিতে বেছে উঠলো তরুণীর হিয়ার নিদাক্ষণ ধিকার।

ছাগলের মত একটা লাফ দিয়ে উঠে বেসিলও চললো তরুণীদের অনুসরণ করে। সিঁড়ির কাছেই শোনা গেল স্তম্ভীত চিলের ডাকের মত তরুণীদের ভয়ানক চীৎকার। তারা সংজ্ঞা হারাবার উপক্রম করলো।

নিমন্ত্রিতেরা দৌড়ে এল সকলে। বুড়ো মূর গিয়ে থিম্চে ধরলেন বেসিলের কোটের কলার। পাইপটা দিয়ে খট করে মাথায় একটা গাঁট্রা মেরে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন—ভুলে যাচ্ছ ?

বুড়ীরা ততক্ষণে সপ্তমে গলা চড়িয়ে কোলাহল তুলেছে। ওয়ান্টার গিন্নী রুমাল দিয়ে ক্লারাকে হাওয়া করতে করতে কট্টকণ্ঠে দমকে উঠলেন—শীগগির তোমার জিপসি ছোড়াকে সরিয়ে নিয়ে যাও মিষ্টার মূর। অতদ্রতার সীমা আছে।

বুড়ো মূর বেসিলকে সেইভাবেই ধরে ছিলেন। এইবার একটি ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—চল শুরোর ঘরে। দেখাচ্ছি মজা।

যেতে যেতে বুড়ীদের দিকে বিষদৃষ্টি হেনে বললেন—জিপসি? মূর ফ্যানিলির ছেলে জিপসি? ইউ ওয়ান্টার্স এণ্ড স্টোকস্ এণ্ড লেন্স...।

ফসিল

করিডরের প্রান্তে পৌছে আর একবার পেছনে তাকিয়ে বুড়ো মূর নিম্নস্বরে গালাগালিটা দিয়েই ফেললেন—ইউ হাফকাস্ট মংগ্রেল্‌স্ !

বেসিল হো হো করে হেসে বললো—ঠিক বলেছ ড্যাড। যত সব পাগল !

বুড়ো মূরের সত্যি দুঃখের দিন আরম্ভ হয়েছে। বেসিলের উন্নততা বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। বুড়োর সকল যুক্তি অল্পনয় মিষ্টিকথা, সব নিষ্ফল হয়েছে।

বেসিল সমস্তক্ষণ থাকে ঘরের বাইরে। দিগ্বিজয়ীর উৎসাহ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে ঘাটে। বুড়ো মূর সমস্তক্ষণ বন্দী হয়ে পড়ে থাকেন বাংলোর ভেতর। সোসাইটিতে আর মুখ দেখাবার দুঃসাহস নেই তাঁর। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে অহনিশ ভৎসনার বিরাম নেই। বেয়ারা খানসামার মুখে বেসিলের প্রাত্যহিক কীর্তিকলাপের খবর কানে আসে। বুড়ো মনের স্বৈর্য্য হারাতে বসেছে।

কিন্তু রেভারেণ্ড জ্যাক প্রায়ই আসেন। শাস্ত্রনা দিয়ে বলেন—আশা ছেড় না মিস্টার মূর। আমি বলছি, প্রডিগাল বেসিল একদিন ফিরে আসবে সুপথে।

সোসাইটিতে সকলে একবাক্যে ঘোষণা করেছে—পাগল না আরও কিছু ! গভীর জলের বদমাস।

এ-বছরেও বেসিল হকি টুর্নামেন্টে খেলতে নামলো, কিন্তু তরুণ সমিতির পক্ষে। জয়ী হলো তরুণ সমিতি। অগ্ন্যান্য টীমগুলো হিংসেয় মুসড়ে গেল বড়। সোসাইটিতে বুড়ো মূরের উদ্দেশে অভিষাপের বর্ষণ হয়ে গেল এক পশলা।

বেসিল ভিড়েছে তরুণ সমিতির সঙ্গে। তরুণ সমিতি নিজেকে

শক থেরাপী

ধন্য মনে করলো এই শ্বেতদ্বীপবাসী খেলোয়াড়ের সাহচর্য লাভ ক'রে। সেক্রেটারী ধীরেন উকীলের বাড়ীতে ভোজের ব্যবস্থা ক'রে বেসিলের সম্বর্দ্ধনা করা হলো।

বেসিল খিচুড়ি খাচ্ছে গোগ্রাসে। ধীরেনের জেঠামশায় রিটার্ড সাব-জজ—শ্রদ্ধাপ্লুত চক্ষে দেখছেন এ দৃশ্য। বললেন—মাঝে মাঝে এ রকম এক আধটা মহাপ্রাণ ইংরেজ দেখা যায়। আমি চটকলের এক সাহেবকে জানতাম, বেচারা কত ভক্তি করে সত্যনারায়ণের সিন্ধী থেতো!

জেঠামশায় বেসিলের সঙ্গে আলাপ করে বললেন—আমিতে না হয় আই পি এস-এ ঢুকে পড় মিস্টার মূর। অফিসার না হ'লে কি তোমার মত ইংরেজকে শোভা পায়?

বেসিল সরোজের কানে কানে জিজ্ঞাসা করলো—ভদ্রলোকের মাথার কোন দোষ আছে না কি?

—আরে না, উনি হলেন ধীরেনের আঙ্কল।

বেসিল হঠাৎ বড় অগমনস্ক হয়ে গেল। অভ্যাগত কত ভদ্রলোক কত কুশলপ্রশ্ন করছেন, বেসিল সাড়া দিচ্ছে না কোন। সে তখন শুধু ঘাড়টা মোরগের মত কাং করে ঘন ঘন চোখ তুলে তাকাচ্ছে ওপরে দৌতলার জানলার দিকে, যেখানে ধীরেনের স্ত্রী, বোন, ভাইঝি এবং আরও পাঁচ ছটি কোঁতুহলী তরুণীর মাথার জটলা।

এ অস্বস্তিকর দৃশ্যটা ভোজনরত তরুণ সমিতির সভোরা সকলেই দেখলো। ধীরেন গম্ভীর হয়ে খেয়ে চললো তাড়াতাড়ি।

জানলার দিকে তাকিয়ে বেসিল ছাড়লো তীব্র কর্ণভেদী একটা শিষ।

কড়া মেজাজের লোক সরোজ। ভোজনান্তে বাইরে গিয়েই চেপে ধরলো বেসিলকে।—তুমি লেডিদের দিকে অমন অভদ্রের মত তাকাচ্ছিলে কেন?

ফসিল

—লেডি ? বেসিল আশ্চর্য্য হলো।

—হ্যাঁ, ঐ জানালার দিকে ?

বেসিল একগাল হেসে গলার স্বর নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললো—
মেয়েগুলো অমন বিস্মিতভাবে তাকাচ্ছিল কেন বলতো ? উদ্দেশ্য কি ?

—আবার বলে মেয়েগুলো ! বাড়ির ঐ লেডিদের কথাই তো
বলছি।

মুখ কাঁচু মাচু ক’রে, মাথার টুপিটা বুকে ঠেকিয়ে বেসিল
বললো—দোষ হয়েছে, মাপ কর। লেডিদের ডাক একবার, মাপ
চেয়ে নি।

—না, থাক্।

—আমার অনুরোধ, ডাক একবার।

—আঃ চুপ করো। তুমি জাননা তাই বলছো। হিন্দু লেডির পূর-
পুরুষের সামনে আসে না।

বেসিল আবার আশ্চর্য্য হয়ে কথাটার মর্ম্ম গ্রহণ করার চেষ্টা
করলো।—পূরপুরুষের সামনে আসে না ? ওরা তা হ’লে বিয়ে করে
কাকে ?

সরোজ বেসিলের অবোধ্য খাটি বাঙলার একটা গালাগালি দিয়ে চুপ
করে গেল শুধু।

বেসিলের এই বেয়াড়াপনার জ্ঞান সকলের মনে যে একটু তিক্ততার
সূচনা করেছিল, কতকগুলো কারণে তা মুছে এল ক্রমশঃ। বড়
সাদাসিধে এই সাহেবটা। খাওয়াতে খরচ করতে কত উদার। ক্লাবে
মোটো চাঁদা দেয়, শিকারে ঘোরার যত পেট্রলের খরচ ও একাই বহন
করে। ফ্যাকাসে বান্ধালী ছেলের মনে যতটুকু দেমাক থাকার কথা,
এই খাটি সাদাচামড়া সাহেবের মনে তাও নেই। মেমসাহেবেরা একে

শক থেরাপী

পাগলা অপবাদ দেবে না কেন ? নইলে ওদের অভিজাত্যের পায়া ভারি থাকে কি করে ?

সরোজের বাড়ীতে সরস্বতী পূজোর ধূম । অনাহৃত বেসিল নিজেই পৌছে গেল । সরস্বতী মূর্তির দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে ।

ধর্মশীল সরোজ ক্ষুব্ধ হ'ল মনে মনে । প্রকাশে বললো—তুমি এসেছ ? যাক্ ভালোই । তবে জুতো পায়ে অতটা এগিয়ে যেওনা ।

বেসিল বললো—দেখছি তোমাদের আইডল । বেশ মেয়েটি, আমার বড় পছন্দ হয় ।

বেসিলকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সরোজ বুঝিয়ে দিলো—খুব ভেবে চিন্তে কথা বলবে । কথ'খনো কারো ধর্ম নিয়ে কণ্ঠি করবে না । কোন হিন্দু তা সহ করে না ।

বেসিল সন্ধে সন্ধে সবিনয়ে মাপ চাইলো—আচ্ছা, কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছি ।—তোমাদের আইডল আমার পছন্দ হয় না । হলো তো ?

তরুণ সমিতির থিয়েটার হবে । সব চেয়ে বেশী টাকা দিল আর পরিশ্রম করলো বেসিল । ষ্টেজ বাঁধা ব্যাপারে একাট দশটা কুলির কাজ ক'রে দিল । ছপুরে বসে বসে গ্যাসবাতিগুলো বেসিলই ঘসে মেজে পরিষ্কার ক'রে রেখে গেল ।

গ্রীণরুমে সবে আলো জ্বলেছে । হুমড়ি দিয়ে ঢুকলো বেসিল । —Where are the heroines ?

বীরেন ও রেবতী তখন দাড়ি কামানো আরম্ভ করেছে মাত্র । সরোজ বেসিলকে দেখিয়ে দিয়ে বললো—ঐ যে ওরা । এখনো ড্রেস করে নি ।

বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলো বেসিল । তারপর অত্যন্ত বিস্মিতভাবে মুখ ভেঙে বললো—পাগলামি পেয়েছ ইডিয়টস্ ? দাঁড়াও !

ফসিল

পট পট ক'রে সব গ্যাসবাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে বেসিল সরে পড়লো। সরোজ প্রতিজ্ঞা করলো—এর প্রতিফল বুঝিয়ে দেব ব্যাটাকে। সেবার মাপ চাইতে ছেড়ে দিয়েছি। আবার বেয়াড়াপন। স্তব্ধ করেছে !

তরুণ সমিতির ভুল ভাঙছে ক্রমশঃ। ধীরেন হয়েছে সব চেয়ে অতিষ্ঠ। রাত-বেরাতে গিয়ে বেসিল ডাকাডাকি করে। কখনো আবার নিঃশব্দে এসে বাগানের ফুলগাছের আড়ালে চোরের মত বসে থাকে। অনেক বোঝানো হয়েছে, কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করছে না। জেঠামশায় ধীরেনকে শাসিয়েছেন—এ রূপী বাদর যদি আবার বাড়ী চড়ে হল্লা করে তবে গকে এবং তোমাকেও খড়ম পেটা করবো।

তবুও বেসিল মাঝরাাত্রে এল ধীরেনকে ডাকতে। জেঠামশায় একটা হেস্ট নেস্ট করবার জন্তু বেরিয়ে এলেন।

বেসিল জেঠামশায়কে দেখেই কুশল জিজ্ঞাসা করলো—কেমন আছ সিক্ ডগ্ ?

ধীরেনও এল। জেঠামশায় ক্রোধাক্ত হয়ে বললেন—এটা একের নম্বরের হারামজাদা হে ধীরেন। এই মাত্র কি বলেছে শুনেছ ?

বেসিল পকেট থেকে বার করলো একটা বোতল আর ছোট একটা গেলাস। হুক্কার দিয়ে উঠলেন জেঠামশায়—এই খবরদার। মত্ত টগ্ থেতে হয় ষ্টেশনের পায়খানায় বসে থেগে যা। ওঠ এখান থেকে।

অবিচলিত বেসিল বললো—চটো কেন আক্ল ? একে বলে হোলি ওয়াটার ; ধীরেন খুব রেলিশ করে।

ধীরেনের মুখের দিকে জলন্ত চক্ষুপিণ্ড ছুটি তুলে জেঠামশায় তাকিয়ে রইলেন।

শক থেরাপী

এতদিনে তরুণ সমিতি বুঝেছে যে বেসিল আসলে পাগল নয়।
ও অগ্র কিছু। পেটে পেটে সূক্ষ্ম একটা উদ্দেশ্য খেলছে। ওর সঙ্গ আর
কোন ভদ্রলোকের পক্ষে নিরাপদ নয়। ধর্ম্মে পর্য্যাস্ত হস্তক্ষেপ করছে।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বাঁচাতে তৎপর হয়ে
উঠলো। তরুণ সমিতি আর বেসিলের অন্তরঙ্গতায় ভাঙন ধরলো
এতদিনে।

এবারের হকি টুর্নামেন্টে বেসিল খেললো বাহাদুর ক্লাবের পক্ষে।
বাহাদুর ক্লাব—বিড়িওয়ালা অক্ষয় যার সিকটারী, লতিফ মিস্ত্রি যার
মানিজার, সজ্জাওয়ালা প্রাণকুমার যার পিসিডেন। এ ক্লাবের
খেলোয়াড়েরা বেশীর ভাগই মোটর বাসের খালাসী।

উন্মাদিক উন্মায় ভদ্রলোকেরা মন্তব্য করলেন,—ইস, অধঃপতন দেখি
অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। সকলে লজ্জিত হলেন এই কথাটা ভেবে,
একদিন এই নিকৃষ্ট রুচির লোকটাকেই তাঁদের ক্লাবে পেয়ে থাও হয়েছিলেন
তারা।

বেসিলের অধঃপতন হয়েছে, কথাটা মিথ্যে নয়। কোন আপত্তি
ওর গতিরোধ করতে পারছে না। অজস্র মূঢ়তার অণু পরমাণু দিয়ে
ও গ'ড়ে তুলেছে নিজের এক বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড। এক বিজাগতিক
আহ্লাদে মজে আছে ওর সমস্ত সত্তা। কী অপ্রমেয় উৎসাহে, অদ্ভুত
ক্ষুধার নিষ্ঠার সঙ্গে স্তরে স্তরে সংসারের মাটি কেটে নীচে নেমে
চলেছে সে। কোথায় যে পাগলের কোহিনুর লুকিয়ে আছে তা সে-ই
জানে।

বেসিলকে দেখা যায় খুব ভোরে—হরিপদর রেস্টোরেণ্টে বসে পরম
তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে চা ও সিদ্ধাড়া। পকেট হাতড়ালে দুচারটে বিড়িও

ফসিল

পাওয়া যায় আজকাল। দুপুরে লতিফের আড্ডায় বসে তবলা পেটাপেটি করে। বিকেলে অক্ষয়ের বিড়ির দোকানে বেকের ওপর শুয়ে শুয়ে গ্রামোফোনের বাজনা শোনে। তালে তালে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মিঠে শিষ দেয়।

অপরিচিত কেউ এমন দীনহীন সাহেবকে দেখে মাঝে মাঝে দয়ার্দ্র ভাষায় প্রশ্ন করে—তোমার বাড়ী কোথায় সাহেব? বেসিল গম্ভীরভাবে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়—বেনারস।

সমস্ত দিন যেখানেই থাক, সম্ভ্রম হ'লে বেসিল অবদার্য্য পৌছে যায় প্রাণকুমারের বাড়ী। তার সাক্ষ্য আড্ডা এইখানে।

কলকাতা থেকে গুপ্তা আইনে তাড়া খেয়ে প্রাণকুমার এখানে এসে সজ্জীর দোকান করেছে। সপরিবারে ভাল মানুষের মত দিনযাপন করে আজকাল। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও ছেলে—চম্পা আর কেউ।

প্রথম দিন। প্রাণকুমারের বাড়ীর দাওয়ায় চাটাইয়ের ওপর বসলো দুই বন্ধুতে। কুলুঙ্গি থেকে প্রাণকুমার নামালো খেনো মদের বোতল। কপাটের ফাঁকে ঊঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চম্পা। বিস্মিত হয়ে বার বার দেখলো বেসিলকে, ভিন্ন গ্রহের জীব আজকের এই নতুন অতিথিকে। বেসিলও যেন থেকে থেকে চমকে উঠলো অদৃশ্য কাঁচের চুড়ির ঠুনকো হাসির শব্দে। আধভেজান কপাট লক্ষ্য করে ছুটে গেল তার শরবৎ দৃষ্টি—বার বার।

পানীয় নিঃশেষ হতে প্রাণকুমার ডাকলো—এবার খাবার দিয়ে যাও।

চম্পা পর্দানশীন নয়। পর-পুরুষের সামনে বের হতে লজ্জা বোধ করবে চম্পা সে জাতের বা সে সমাজের মেয়ে নয়। আগে ঠিক

শক থেরাপী

এইখানেই দাঁড়ায় ওপর বসতো জুয়াড়ীর আড্ডা। বথরা নিষে যখন হাতাহাতির যোগাড় হতো তখন চম্পাই এসে প্রাণকুমারকে ঠেলে নিয়ে বন্ধ করতো ঘরে। বাঁটা হাতে সামনে দাঁড়াতেই সব জুয়াড়ী সরে পড়তো একে একে।

আজ ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে চম্পা ঘেমে উঠলো। লজ্জা করছে তার। নিজেরই কাছে এ লজ্জা ধরা পড়ে চম্পা আরও লজ্জিত হলো।

আবার এলো ডাক—খাবার দাও শীগগির। অগত্যা আসতে হলো চম্পাকে। দুটো থালায় রুটি তরকারী বয়ে নিয়ে সসঙ্কোচে চম্পা বেরিয়ে আসতেই বেসিল ব্যস্ত হয়ে টুপি হাতে উঠে দাঁড়ালো। প্রাণকুমার বললো—থাক্ হয়েছে, তুমি বসো। বেশী কায়দা করতে হবে না।

বেসিল পর পর তিনটে গান শোনালো। চম্পা ঘরের ভেতর লুটিয়ে পড়তে লাগলো হেসে হেসে।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে বেসিল দেখলো বড়ো মূর তখনো বাগানে একটা সোফায় মুসড়ে নিশুম হয়ে পড়ে আছে। বড়োর হাঁটুতে হাত রেখে বেসিল ডাকলো—ভ্যাড!

—কে, বেসিল!

—মুসংবাদ ভ্যাড। আজ একজন ইণ্ডিয়ান লেডির সঙ্গে পরিচয় হলো।

দুচোখ বিস্ফারিত করলেন বড়ো মূর।—সর্বনাশ! ভুল করেছ ডিয়ার বয়, মস্ত ভুল করেছ। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে লেডি হয় না। তুমি সময়তানের ছায়া দেখেছ।

বেসিল ওঠবার উপক্রম করতেই বড়ো খুব মিষ্টি করে বললেন—শোন বেসিল, কথা আছে। আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে তোমার কাজের চিঠি এসেছে। বল, কি উত্তর দিই?

ফসিল

—লিখে দাও, বেসিল মূর একজন পাগল।

—দূর হও। দূর হও।

—ছঃখ করো না ড্যাড। আমি ভেবে দেখেছি আমি একজন পাগল।

প্রাণকুমারের বাড়ীর সাক্ষ্য আড্ডাই এখন বেসিলের সমস্ত দিনের ধ্যান। প্রাণকুমারও ওকে অবাধ প্রশ্রয় দিয়েছে। এখানে ওখানে ছুঁচারটে নিন্দার কথাও ওঠেনি তা নয়। তবুও।

নেশায় যখন প্রাণকুমার ঢলে আসে, বেসিলের চোখে তখন রং লাগে শুধু। হেঁড়ে গলায় চৌচিয়ে কেঁপে ডাকতে থাকে—কিসটো কিসটো। চম্পা অগত্যা বেরিয়ে এসে বলে—চৌচিও না, আমার নিন্দে হয় জান ?

—আচ্ছা বেশ। কিসটোকে পাঠিয়ে দাও, ওকে আদর করবো।

—না, এখন বাড়ী যাও। রাত হয়েছে।

এমনি এক বৈঠকে, প্রাণকুমারের নেশার জোর সেদিন একটু মাত্রার বাইরে। বললো—এ জীবন আর ভাল লাগে না। আমি মরবো।

বেসিল বললো—তুমি নির্ভয়ে মর। তোমার বউ ছেলের চার্জ নেব আমি।

—শালা মনহুস্! প্রাণকুমার খালি বোতলটা তুলে নিয়ে বেসিলের কানের ওপর জমিয়ে দিল প্রচণ্ড এক আঘাত। দুহাতে মাথা চেপে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো বেসিল। চম্পা বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এসে প্রাণকুমারের হাত থেকে কেড়ে নিল বোতলটা। বললো—কালাপানি যাবার সখ হয়েছে ?

বেসিলের কোর্টের আস্তিন থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। চম্পা ডাকলো—সাহেব। বেসিল সাড়া দিল না কোন।

শক থেরাপী

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল চম্পা। তারপর সোনালী চুলে ভরা বেসিলের মাথায় হাতটা রেখে আস্তে আস্তে আবার ডাকলো—বেসিল ? সাহেব ?

অন্ধনির্মীলিত চোখে প্রাণকুমার আবার তর্জ্জন করে বোতলটা তুলবার চেষ্টা করলো—এঁ্যা চোখের সামনেই...।

হঠাৎ বেসিল উঠে বললো—মাপ করো। আমি আর কখনো ও কথা বলবো না। গুড বাই !

পরদিন প্রাতে বেসিলকে সহরে দেখলো না কেউ। খবরাখবরে দকলেই জানলো কি ব্যাপার। অক্ষয়, লতিক, আরো অনেকে মারমুর্ভি হয়ে প্রাণকুমারকে চেপে ধরলো। —ক্ষ্যাপাটে বলেই তুমি ওকে কসাইয়ের মত মারবে ? ওরই পয়সায় ঘটি ঘটি মদ গিলছো রোজ, লজ্জা করে না ? বাঘ না হয় তার পরিচয় ভুলে ভেড়ার দলে মিশেছে। তা বলে তাকে গুঁতোতে হবে ?

চম্পা স্পষ্ট জানালো প্রাণকুমারকে—কিছু শুনবো না। যাও, যেখানে বেসিল আছে নিয়ে এস। নিশ্চয় জখম হয়ে ও কোথায় পড়ে আছে। ঐ জখম তোমাকেই ভাল করতে হবে।

একজন কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর এলেন।—বুড়ো মূর সাহেবের ছেলেকে মেরেছ তুমি ? গুণাগি করে স'রে যাবে মনে করেছ ? ইন্সপেক্টর প্রাণকুমারের একটা কান মুঠো করে ধরলেন।

মাথায় পটিবান্ধা বেসিল সাইকেল থেকে হঠাৎ এসে নামলো। সটান এসে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কে ?

—আমি রায় বাহাদুর মহেশ্বরী সিং, ইন্সপেক্টর অব পুলিশ।

—লুক হিয়ার পুলিশ ম্যান ! তুমি যদি আমার কোন ব্যাপারে নাক ঢোকাতে আস, তা হ'লে সে নাক আমি এই রকম সমতল করে দেব। বেসিল তার জুতোর সোলটা তুলে দেখিয়ে দিল।

ফসিল

পুলিশ ইন্সপেক্টর চাপা রাগে ফুলে ফুলে বললেন—বেশ, তোমার বাবার অনুরোধ মত আমি ভাল করতে এসেছিলাম। এবার তাকে গিয়েই সব বলছি।

—হ্যাঁ, যাও।

এদিকে ওদিকে বেসিলের আর ভ্রক্ষেপ নেই। সোজা দাঁড়িয়ে উঠে ডাকলো—কিসটো! কিসটো! কপাটের ফাঁকে দেখা দিল চুড়িপর হাত আর শাড়ীর আঁচল।

লতিফ সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো—চলো ইয়ার! আমরা বুথ কেন আর এখানে!

অক্ষয় বললো—হ্যাঁ চলো। এ বিলিতি সরবত বাবা। বড় ভো স্ত্রগার!

প্রাণকুমারের পরিবর্তন এসেছে। সংসারে এবার থেকে সে বেশ একটু আলগা হয়ে থাকছে যেন। বেসিলের মাথা ফাটানোর পর থেকে নিরন্তর একটা অন্তশোচনা তাকে নরম করে দিয়েছে বড়। কোন ব্যাপারে আজকাল প্রতিবাদ তো করেই না, এমনিতেই কথা বলে কম।

চম্পারও পরিবর্তন কিছু কম নয়। সম্বো হবার আগেই প্রত্যহ তার প্রসাধনের ব্যস্ততা বেড়ে উঠেছে অনেক। এক ছাঁদে দুটো দিন আর খোপা বাঁধে না। রকম স্কম দেখে প্রাণকুমার ছু'একবার ঠাট্টাও করেছে—কি ব্যাপার? মেমদের ভাত মারবে না কি?

এদিকের আকাশে ধীরে মিইয়ে এল গোধূলির ছটা। ওদিকে ঝাউবনের মাথার ওপর জাঁকিয়ে ভেসে উঠলো পূর্ণিমা চাঁদ। তিন শো চৌষটি দিনের সব হিসেব ভুল করার লগ্ন এল ঘনিয়ে। আজকের

শক থেরাপী

এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে প্রগল্ভ বেদনায় অস্থির হয়ে উঠবে নরনারীর স্বাস্থ্য।
আজ হোলি উৎসব।

চকবাজারে আবীরের ঝড় উঠেছে। উদ্দাম ঢোলকের বাজ, চীংকার, নাচ, থিস্তি, গান আর কুস্কুমের মার চলেছে সেখানে। পিচকারী বৃক্ষে চকের পথটাও রঙে রঙে বিচিত্রিত। মাতালের বমির উপদ্রবে ড্রেনের ব্যাংগুলো উঠে পড়েছে সড়কে।

শ'পাঁচেক উৎসাহী দর্শক বৃত্তাকারে ঘিরে ডোমেদের সং দেখছে। তারই মাঝখানে গাধার পিঠে চড়ে পাগলা বেসিল—মাথায় টোপরের মত একটা বিস্কুটের টিন। ডোম ছেলেরা বিকট উল্লাসে চীংকার করে বেসিলের গায়ে ছুঁড়ে মারছে মুঠো মুঠো ফাগ। বেসিলও অল্পপ্রাণিত হয়ে গাধার পেটে লাথি মেয়ে চক্কর দিচ্ছে বোঁ বোঁ করে। মাঝে মাঝে ধেনো মদের বোতল মুখে উপুড় করে ঢেলে নিচ্ছে এক এক ঝলক, আর কড় কড় করে চকোলেট চিবিয়ে চলেছে।

চম্পা আজ দুপুর থেকে ঘরে বসে রান্না করেছে নানা রকম স্ন্যাক্স। আজ ঘরের বাইরে একটু উঁকি দিয়ে দেখবারও উপায় নেই। সেই মুহূর্তে পথের ভীড় থেকে হাজার হাজার গলায় গর্জে উঠবে পেউড়ের উল্লাস।

চম্পা আজ পরেছে উৎসবের বেশ। ডুরে শাড়ী আর জরদা রঙের ঝুলা, তার ওপর রূপোর আভরণ। কোমরে ছড়িয়ে দিয়েছে চণ্ডা বিছুয়া, হাতে বাজু আর কঙ্কন, গলায় হাঁসুলি আর দুপায়ে ঘুড়ুরদার ছড়া। স্বস্তি টেনে চোখের টানা বাড়িয়েছে চিত্রা হরিণের মত।

চম্পা জানে প্রাণকুমার আজ আসবে না। কোন বছরই হোলির দিনে সে থাকে না। দুটো দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়।

ফসিল

কিস্তি । চম্পা আজ ভাবছে—বেসিল যদি আসে ।

দাওয়ার ওপর মচ নচ জুতোর আওয়াজ । এক মুঠো ফাগ নিয়ে বেসিল এসে দাঁড়ালো ।

—চম্পা !

ঘরের ভেতর শিউরে উঠলো চম্পা । বেসিল আজ তারই নাম ধরে ডাকছে, অতদিন ডাকে কেস্টোকে ।

—আজ হোলি হায় চম্পা !

বাইরে আসতে হলো চম্পাকে । বেসিল হাতের ফাগ নিয়ে লেপে দিলো চম্পার মুখে । আঁচলে চোখ মুখ মুছে একটু স্থস্থির হয়ে চম্পা দাঁড়িয়ে রইলো ।

নেশায় তরল চোখের তারা দুটো তুলে চম্পার দিকে তাকিয়ে বেসিল বললো—চম্পা !

—কি বেসিল !

—তোমায় আজ একটা কথা বলবো । এবার চম্পার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল । পালিয়ে যেতেও অক্ষম—পা দুটো অচল অনড় হয়ে গেছে । একটু ভেবে নিয়ে চম্পা শেষে হাত জোড় করলো । মিনতি করে বললো—না, বলো না ।

—উপায় নেই । আমি বলবোই ।

—না, বলো না বেসিল ।

মাথাটা থেকে থেকে ঝুঁকে পড়ছে সামনে । কপালটা একহাতে টিপে ধরে বেসিল তবুও দাঁড়িয়ে । চম্পা কপালের ঘাম আর চোখের কোণ দুটো আঁচলে মুছে নিয়ে ঘেন দম ছেড়ে নিল । বললো—আচ্ছা, আর একদিন বোলো ।

—গুড নাইট ! বেসিল শীঘ্র বাজিয়ে সটান চলে এসে একটা রিক্সার

শক থেরাপী

ওপর বসলো তালগোল পাকিয়ে।—চলো, দি রিড্‌টীট ! গান ধরলো
গলা খুলে—

...There was a green hill far away
And I saw her in a silvery night...

উৎসবের প্রমত্ততা শেষ হয়ে আসে অবসাদ। চম্পার এল জ্বর—শুধু
জ্বর। প্রথম দিন থেকেই বেহঁস। প্রাণকুমার চিকিৎসার ক্রটি করলো
না। চম্পারই উৎসব দিনের আভরণগুলো একে একে বিক্রী করে ডাক্তার
আর ওষুধের খরচ জোগানো হলো—ক্রমাগত সাত দিন ধরে।

হকি মাচ থেকে ফিরে এসে বেসিল দেখলো সিভিল সার্জন মিত্র
সাহেব চম্পাকে দেখে চলে যাচ্ছেন। পথরোধ করে দাঁড়ালো বেসিল—
কি সার্জন ? কার ট্রিটমেন্ট করছো ? রোগীর না তোমার মনিব্যাগের ?

—কি বললে ? আমার ট্রিটমেন্টের কমপ্লেন করছো ? তোমার
সাহস তো খুব !

—সেই তো আমার দুঃখ। তোমাকে জেলে দেওয়া উচিত, তা না
করে শুধু কমপ্লেন করতে হচ্ছে।

—ভাল ক'রে কথা বল মিষ্টার ম্যুর। আমরা শুধু ভাল ট্রিটমেন্ট
করতে পারি। ভাল করা ভগবানের হাত।

বেসিল চট করে মাথার টুপিটা খুলে ভিক্ষেপাত্রের মত ধরলো মিত্র
সাহেবের সামনে। বললো—যা কিছু কৌ নিয়েছ ফেরত দাও। প্লাজ।
ওগুলো ভগবানকেই দেব।

প্রাণকুমার এসে বেসিলকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যেতে যেতেই বেসিল
আরও ছুচাচটে কথা শুনিতে দিয়ে গেল—আমার উপদেশ শোন সার্জন।
সুয়ারের হাসপাতালে কাজ নাও। ওরা কমপ্লেন করেনা।

ফসিল

প্রাণকুমারকে বেসিল বোঝালো—এদের ভরসা ছাড়। এরা বড় বুদ্ধিমান। আমি নিয়ে আসছি একজন এপথিকারী। ওদের বুদ্ধি কম—সর্বনাশও করে কম।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বেসিল সহরের সব অলি গলি ঘুরে বেড়ালো। একটা ইংরাজীতে লেখা বিবর্ণ সাইনবোর্ড খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিয়ে সে বাড়ীটার বারান্দায় উঠে ডাকলো—কবিরাজা!

কেরোসিনের ডিভরি হাতে অতি সন্তুর্পণে বেরিয়ে এল লাটু কবরেজ। বেসিলকে দেখে পাঁশুটে হয়ে গেল তার মুখের রং। বললো—আমি তো সঞ্জীবনী রাখিনা সাহেব।

—জ্বর ভালো করতে পার? ভাল ফঈ দেব।

ধড়ে প্রাণ এল লাটুর।—জ্বর? আমার খলের আওয়াজে জ্বর পালায়।

—একদিনে পারবে?

—এক ঘণ্টায় পারবো। তবে ঐ যা বলো!

—আচ্ছা এস।

—নাড়ী দেখবার জন্তে কিন্তু একস্ট্রা ছ' আনা নেব।

—বেশ পাবে।

—আর, মোক্ষম ওষুধ চাও তো সাত আনা লাগবে বলে দিচ্ছি।

—হ্যাঁ পাবে। শীগগির চলো ম্যান।

লাটু তবুও বসে রইলো। আমতা আমতা করে দুবার মাথা চুলকে বিনীত ভাবে বললো—সাহেব, আদ্যে এক এডভান্স কর মাইরী!

—হোয়াট ম্যাডনেস! বেসিল লাটুর হাতে একটা সিকি ধরিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে একরকম দৌড়েই পৌছল প্রাণকুমারের বাড়ী। চম্পার তখন আর জ্বর নেই; হিম হয়ে এসেছে হাত পা। হেঁচকি আরম্ভ হয়েছে।

আজ বেসিলের সাক্ষ্য আড্ডা কাটলো আবগারী দোকানে। প্রচুর

শক থেরাপী

মদ খেয়ে এসে শুয়ে রইলো প্রাণকুমারের সজ্জীর দোকানে—বেগুনের
ঝুড়িগুলোর ওপর। গভীর রাত্রে পথে যেতে অনেকে শুনলো পাগলা
বেসিলের কাতরানি। —সাহেবটা আজ বেহেউ হয়েছে।

ভোরে, সূর্য্য ওঠার আগেই। চম্পাকে খাটিয়ায় তুলে নিয়ে শ্মশান-
বাত্রী কুটুমেরা চলেছে। কেউকে কোলে করে সঙ্গে চলেছে প্রাণকুমার।
পেছনে বাহাদুর ক্লাবের বিমর্ষ সভাবন্দ—লতিফ, অক্ষয়, আরও অনেকে।
সবার পেছনে হকি ষ্টিক কাঁধে, একটা লম্বা খড় দাঁতে চেপে চলেছে বেসিল।

ক্ষীরগাঁও নদী—কালির মত ঝিকঝিকে লঘু জলের শ্রোত ; চওড়া
বালির চড়া। তারই উপর এক জায়গায় চিতা সাজানো হয়েছে।
মুড়িপোড়া বামুনেরা একটা আগুনের কুণ্ড রচনা করেছে—চন্দনকাঠ
কাটছে কুচো কুচো করে। একটু দূরে বালির ঢিবির ওপর বসে আছে
অক্ষয়, লতিফ আর বেসিল—অনাস্থায়ী শ্মশানবন্ধুর দল।

চম্পাকে খাটিয়ে থেকে নামিয়ে শ্রোতের ওপর শোয়ানো হলো
শবস্ত্রানের জগা। একটু গভীরজলে নিয়ে বার দুয়েক চুবিয়ে বালির
চড়ার ওপর রাখা হ'ল।

কে একজন বললো—হাতের চুড়িগুলো রাখতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে
আর একজন একটা পাথর দিয়ে চম্পার কজ্জি ছোটো পিটিয়ে পিটিয়ে
রূপোর চুড়ি ছগাছি খুলে নিলো।

পুরুত মিসিরজি বললেন—এবার ঘি লেপে দাও সর্কাঙ্গে।

প্রাণকুমার এক থাবা ঘি নিয়ে মাথাতে লাগলো চম্পার পায়ে বুক
মাথায়। মিসিরজি বললেন—মাথ মাথ। এ সব কাজ একটু শক্ত
হৃদয়ে করতে হয়। আত্মা যখন চলে যায় তখন আর কি থাকে ?
মিট্টিকা পুতলা। এতে আবার লজ্জা!

ফসিল

হকি ষ্টিকটাকে শক্ত মুঠোয় ধরে বেসিল ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে ।
বাতাসে ফর, ফর করে উড়ছে ওর গলার লালরঙা টাই ।

লতিফ বললো—বসো বেসিল । বসে বসে দেখ ।

—না, বসবো না । টেরিবল্ । ওরা রোষ্ট করবে এখনি ।

মিসিরজি মস্ত পড়ছেন—ওঁ দেবাস্চাগ্নি মুখা সর্বো হতাশনং গৃহীত্বা... ।

প্রাণকুমার ঘি মাগিয়ে চলেছে । বালিমাথা চম্পার মাথাটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে শাস্ত্রাচারের দাপটে । এলো চূলে লেগে আছে একটা শ্মাঙলার চাপড়া । ভেজা ডুরে শাড়ী ল্লথ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে বালির ওপর ।

হঠাৎ একটা পোড়া ইট ভীমবেগে মিসিরজির বৃকে এসে আঘাত করলো ।—বাপ রে বাপ । মিসিরজি বৃকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন ।

লতিফ আর অক্ষয় চোঁচালো—ধর ধর, পাকড়ো ।

—You Cannibals ! বেসিল হকি ষ্টিক হাতে বাঁপিয়ে পড়লো
শ্মশানবন্ধু জনতার ওপর । প্রাণকুমার এসে ধরলো বেসিলের চুলের ঝুঁটি ।

বেসিল আজ আর কাউকে চিনতে পারছে না যেন । থর থর করে কাঁপছে ওর চোয়ালের হাড় । নীল চোখ দুটো তেতে জ্বলছে স্পিরিট-ষ্টোভের স্থির শিখার মত । লালমুণের কুঞ্চিত মাংসের রেখায় রেখায় প্রতিহিংসা মূর্ত হয়ে উঠেছে ।

শ্মশানকুটুমেরা ততক্ষণে কুড়িয়ে নিয়েছে এক একটা বাঁশ । ছুমিনিটের মারেই বেসিলের হকি ষ্টিক খসে পড়লো হাত থেকে । লতিফেরা এসে ওকে একরকম হেঁচড়ে নিয়েই চলে গেল । পরিশ্রান্ত অক্ষয় হাঁফ ছেড়ে বললো—উং, বিলিতি পাগল ; ভূতের চেয়েও সাংঘাতিক ।

শ্মশান থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে লতিফ বেসিলকে ছেড়ে দিয়ে বললো—এবার বাড়ী যাও, বেসিল ।

শক থেরাপী

ক্ষীরগাঁও নদীর সর্পিল বালুরেখা ধরে বেসিল চললো। ছপুন্দের সূর্য্য তেতে উঠেছে। কাকের দল নেমেছে স্রোতের জলে পাখা ধুতে। বালিয়াড়ির মরা গুগলি শামুক মাড়িয়ে বেসিল চললো।

সামনে পাহাড়তলীর চড়াই; পেছনে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত; অদূরে ইউকালিপটাসের ছায়ায় নিঝুম—দি রিটিট।

এখানে দেখবার কেউ নেই। বেসিল শুয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। বিকেল শেষ হ'ল, রোদ পড়ে সন্ধ্যা হ'ল। ঘুঘুর দল আশে পাশে ধানের শীষ খেয়ে চলে গেল। বেসিল টের পেল না কিছুই।

ঘুম ভেঙে বেসিল প্রথম চোখ মেলে দেখলো—সামনেই কাসেলের পিনাকেল; পাশে বড় একটা তারা উঠেছে। পেছনের অন্ধকারে, দিগন্ত-জোড়া মুরল্যাঙের বৃকে যেন পুঙ্খ পুঙ্খ কুয়াশা রয়েছে থমকে। একটা লার্ক ডেকে ডেকে উড়ে চলে গেল দূর হিলকের দিকে। এগিয়ে চললো বেসিল।

বাঁয়ে মাচান করা আঙুরের ইয়ার্ড ফেলে, মাঠভরা ভেজা ডেজি মাড়িয়ে বেসিল এগিয়ে চলেছে। আজ বাতাসে থেকে থেকে ভেসে আসছে এপ্রিল দিনের অকিডের মুদ্রা স্তম্ভ। অলিভ গ্রোভের অন্ধকার থেকে এক ঝাঁক ম্যাগপাই উড়ে পালিয়ে গেল তার পায়ের শব্দে। জাঁর্ণ অ্যাভির ইট পাথরের স্তূপ থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁর ডাক।

এবার বেসিল পৌছেছে ডাইকের কাছে। পুরানো সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে শুনলো—বহু দূরে বর্ণার জলধারা গানের মত কাউন্টি চার্চের অর্কেষ্ট্রা। সামনেই বেলে পাথরের রাম্পার্ট—তারপর ফটক। নিরেট শতাব্দীর বাসা ঐ কাসেল। পিতামহের স্নেহে চেয়ে রয়েছে তার প্রতীক্ষায়।

বেসিল বেশ বুঝলো, তার ধমনী থেকে আজ নেমে গেছে একটা বিষের ভার। নতুন রকম লাগছে আজকের নিঃশ্বাস।

অযান্ত্রিক

বিমলের একগুঁয়েমি যেমন অব্যয়, তেমনি অক্ষয় তার ঐ ট্যাক্সিটার পরমাণু। সাবেক আমলের একটা ফোর্ড—প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্বোচ্চ একটা কদর্য্য দীনতার ছাপ। যে নেহাৎ দায়ে পড়েছে বা জীবনে মোটর দেখেনি, সে ছাড়া আর কেউ ভুলেও বিমলের ট্যাক্সির ছায়া মাড়ায় না। দেখতে এমনি জবুখবু কিন্তু কাজের বেলায় অদ্ভুত-কর্ম্ম। বড় বড় চাইগাড়ীর পক্ষে যা অসাধ্য, তা এর কাছে অবলীলা। এই দুর্গম অভ্রখনি অঞ্চলের ভাঙ্গাচোরা ভয়াবহ জংলীপথে—ঘোর বর্ষার রাত্রে—যখন ভাড়া নিয়ে ছুটতে সব গাড়ীই নারাজ, তখন সেখানে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতে পারে শুধু বিমলের এই পরম প্রবীণ ট্যাক্সিটী। তাই সবাই যখন জবাব দিয়ে সরে পড়ে—একমাত্র তখন শুধু গরজের খাতিরে আসে তার ডাক, তার আগে নয়।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে সারি সারি জমকালো তরুণ নিউ মডেলের মধ্যে বিমলের বুড়ো ফোর্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিমোয়—জটায়ুর মত তার জরাভার নিয়ে। বাস্তবিক বড় দৃষ্টিকটু। তালিমারা হুড, স্মুথের আর্শিটা ভাঙ্গা, তোবড়া বনেট, কালিঝুলি মাথা পরদা আর চারটে চাকার টায়ার পটি লাগানো—সে এক অপূর্ব্ব শ্রী। পাদানীতে পা দিলে মাড়ানো কুকুরের মত কাঁচ করে আর্ন্তনাদ করে ওঠে। মোবিল অয়েলের ছাপ লেগে সীটগুলি এত কলঙ্কিত যে, স্ববেশ কোন ভদ্রলোককে পায়ে ধরে সাধলেও তাতে বসতে রাজী হবে না। দরজাগুলো বন্ধ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, আর যদিচ বন্ধ হ'ল তো তাকে খোলা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। সীটের উপর বসলেই

অযান্ত্রিক

উপবেশকের মাথায় আর মুখে এসে লাগবে ওপরের দড়িতে ঝোলানো বিনলের গামছা, নোংরা গোটা দুই গেঞ্জী আর তেলচিটে আলোয়ান।

বিনলের গাড়ীর দুরায়াত ভৈরব হর্ষ শোনা মাত্র প্রত্যেকটি রিক্সা দভয়ে রাস্তার শেষ কিনারায় সরে যায়—অতি দুঃসাহসী সাইক্লিষ্টেরও দাবমান বিনলের গাড়ীর পাশ কাটিয়ে বেতে বুক কাঁপে। রাত্রির অন্ধকারে এক একবার দেখা যায়, দূর থেকে যেন একটা একচক্ষু দানব অট্টশব্দে হা হা করে তেড়ে আসছে—বুঝতে হবে ঐটি বিনলের গাড়ী। হেড লাইটের আলো নিক্রাণপ্রাপ্ত, আলগা আলগা শরীরের গাঁটগুলো—যে কোন সময়ে বিস্ফোরকের মত শতধা হয়ে ছিটকে পড়বে বোধ হয়।

সব চেয়ে বেশী ধুলো ওড়াবে, পথের মোঘ ক্ষাপাবে আর কাণফাটা আওয়াজ করবে বিনলের গাড়ী। তবু কিছু বলবার জো নেই বিনলকে। চটাং চটাং মুখের ওপর দু'কথা উন্টে শুনিয়ে দেবে—মশাই বুঝি আর হাগেন না মোতেন না—চঁচান না দৌড়ন না? যত দোস করেছে বুঝি আমার গাড়ীটা!

কত রকমই না বিদ্রূপ আর বিশেষণ পেয়েছে ঐ গাড়ীটা—বুডটা ঘোড়া, খোড়া হাঁস, কাণা ভঁইস! কিন্তু বিনলের কাছে সে জগদল—এই নামেই বিনল তাকে ডাকে, তার বাস্তব-ত্রস্ত কর্মজীবনে স্তূর্দীর্ঘ পনেরটি বছরের সাথী ঐ যন্ত্রপাশটা—সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা।

সন্দেহ হতে পারে বিনল তো ডাকে, কিন্তু সাড়া দেয় কি? এটা অন্নের পক্ষে বোঝা কঠিন। বিনল খুবই বোঝে—জগদলের প্রতিটি সাধ আকার অভিমান বিনল পলকে বুঝে নিতে পারে।

‘ভারী তেষ্ঠা পেয়েছে না রে জগদল? তাই হাঁসফাঁস কচ্ছিস? দাঁড়া

ফসিল

বাবা দাঁড়া।' জগদলকে রাস্তার পাশে একটা বড় বট গাছের ছায়ায় থামিয়ে বিমল কুঁয়ো থেকে বালতি বালতি ঠাণ্ডা জল আনে, রেডিয়েটরের মুখে ঢেলে দেয়। বগ বগ করে চার পাঁচ বালতি জল খেয়ে জগদল শান্ত হয়, আবার চলতে থাকে।

এ ট্যাক্সির মালিক ও চালক বিমল স্বয়ং। আজ নয়, একটানা পনের বছর ধরে।

স্ট্যাণ্ডের এক কোণে তার সব দৈন্য জরাভার নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো জগদল। পাশে হাল মডেলের বৃষ্টিকটার স্তম্ভের ছাইরঙা বেনেটের ওপর গা এলিয়ে বসে পিয়ারা সিং বিমলকে টিটকারী দিয়ে বলে—‘আর কেন এ বিমলবাবু—এবার তোমার বুড়ীকে পেনসন দাও।’

—‘হুঁ, তারপর তোমার মত একটা চটকদার হাল-মডেল বেশে রাখি।’ বিমল সটান উত্তর দেয়। পিয়ারা সিং আর কিছু বলা বাহুল্য মনে করে; কারণ বললেই বিমল রেগে যাবে আর তার রাগ বড় বুনো ধরনের।

কার্তিক পূর্ণিমায় একটা মেলা বসবে এখান থেকে মাইল বারো দূরে—সেখানে আছে নরসিং দেবের বিগ্রহ নিয়ে এক মন্দির। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে যাত্রীর ভীড়—চটপট ট্যাক্সিগুলো যাত্রী ভরে নিয়ে হুস হুস করে বেরিয়ে গেল। শূন্য স্ট্যাণ্ডে একা পড়ে পড়ে শুধু ধুকতে লাগলো বুড়ো জগদল। কে আসবে তার কাছে—ঐ প্রাগৈতিহাসিক গঠন আর পৌরাণিক সাজসজ্জা।

গোবিন্দ এসে সমবেদনা জানিয়ে বলল—কি গো বিমলবাবু, একটাও ভাড়া পেলে না?

অযান্ত্রিক

—না।

—তবে ?

—তবে আর কি ? এর শোধ তুলব সন্ধ্যায়। ডবল ওভারলোড নেব, যা থাকে কপালে।

—ও ক’রে আর কদিন কারবার চলবে। বরং এইবার আর দেরী না করে জগদ্বলকে এক্সচেঞ্জে দিয়ে ঝরিয়। থেকে আনিয়ে নাও মগন-লালের গাড়ীটা। তোফা ছ’সিলিঙার সিডান সত্যি।

—আরে যেতে দাও, কে অত ঝগ্গাট করে বল ?

—এটা হ’ল ঝগ্গাট, আর নিত্যি এই লুকিয়ে পাকিয়ে ওভার-লোড নেবার হয়রানী, সেটা ঝগ্গাট নয় ?

—না ভাই যেতে দাও ওসব কথা। নাও, বিড়ি খাও।

গোবিন্দ চূপ করে গেল। জগদ্বলের প্রসঙ্গ পরের মুখে আলোচনা বিমল কোনদিনই বরদাস্ত করে না। চেপে যাওয়াই ভাল, নইলে এখনি হয়তো একটা ইতরভাষা ব্যবহার করে বসবে।

বাজে কথায় মন না দিয়ে বিমলও ক্যানেন্সারা ভরে জল নিয়ে এল—
পিচকারি দিয়ে বুড়ো জগদ্বলের ধুলোকাদা ধুতে লেগে গেল। হামা দিয়ে গাড়ীটার তলায় চুকে চিং হয়ে শুয়ে পিচকারির জল ছড়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, টাইরডের গলায় গোবরের দাগটা গেল কি না ? ডিফারেনসিয়ালের বর্ভুল পেটটা হাতা দিয়ে ঘসে ঘসে চকচকে করে ফেলে। আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—আঃ হুডটা বেজায় পুরনো, দু’জায়গায় ফেটে মস্ত বড় ছটো ফাঁক হাঁ করে আছে।

—কি করব জগদ্বল ! এবার তালি নিয়েই কাজ চালা। আসছে পূজোয় কটা ভাল রিজার্ভ পেলে তোকে নতুন রেক্সিনের হুড পরাবো। নিশ্চয় !

ফসিল

জগদলের প্রসাধন এখানেই ক্ষান্ত হয় না। পকেট হাতড়ে বিমল শেষ ছ্যানীটা বার করে—কেরোসিন তেল কিনে এনে বন্টুগুলোর মরচে মুছতে লেগে যায়।

গৌর এসে বলল—‘এ্যা, এ কি হচ্ছে বিমলবাবু, ভাঙা মন্দিরে চূণকাম !

বিমল বিস্মিতভাবে মুখ বিকৃত করে খেঁকিয়ে উঠল—সোজা কেটে পড় না রাজা এখান থেকে, কে তোমায় ধক ধক করতে ডেকেছে।

বিমল এইটেই বুঝে উঠতে পারে না যে, তার এইসব প্রাইভেট ব্যাপারে অপরে এত মাথা ঘামাতে আসে কেন ?

‘প্রাইভেট’—পিয়ারা সিং হেসে যেন গড়িয়ে পড়ে।—‘গাড়ীভি ঘরকা আওরাত হায় ক্যা ?’

কারবার ডুবতে বসেছে, তবুও বিমলের ঐ এক রোখ। এই কুদৃশ্য বুড়ে। গাড়ীটার উপর একটা উৎকট মায়া তার কারবারী বুদ্ধিকেও দিয়েছে ঘুলিয়ে। তা না হ’লে এত বড় মক্ষিচোষক রূপণ বিমল—যে ধানবাদে পুরির দাম বেশী বলে দিনটা উপোষে কাটিয়ে পরদিন গয়ায় ফিরে সস্তাদরে দুগুণ খাওয়া খায় ; সেই বিমল অকুণ্ঠহাতে এ গাড়ীর পিছনে খরচ করে চলেছে, ভস্মে ঘি ঢালছে !

বুলাকি পাগলারও এমনি ধরণের স্নেহান্বিতা ছিল তার একটা ভাঙা টিনের গামলার ওপর। নিজে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজত, কিন্তু ছাতা দিয়ে সময়ে ডেকে রাখতো তার ভাঙা গামলাটিকে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে এল, দোকানগুলোতে ছু’-একটা পেট্রমাক্স বাতি উঠল জলে। ময়রার দোকানের উহুন থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারটা আরো পাকিয়ে তুলল। অদূরে ট্রাফিক

অযান্ত্রিক

দলিশটাকেও একটু আনমনা দেখাচ্ছে। পোটলা-পুঁটলি নিয়ে একদল চ'ষী গেরস্থ আসছে এইদিকে—দূর দেহাতের যাত্রী সব। এই তো হুত লগ্ন।

বিমল ঠাকুর, গলা নয়তো যেন চোওবিশেষ—চলা আও, চলা আও।
শামগড়, রাঁচী, নয়ানরাই। মকুংগঙ্গ, চিত্রপুর, ঝালদা। কনসেসান
রেট—কনসেসান....

আগন্তুক যাত্রিদলের কানের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছল এ ডাক।
কনসেসান রেট—কিন্তু সংখ্যায় চৌদ্দজন। বুড়ো জগদলের উদর গহ্বরে
ছ'জনের স্থানে ঠেসে দিল চৌদ্দজনকে। ভবত কাঙ্গারুর পেট, কার সাধা
বোঝে বাইরে থেকে ক'টি জীব সেখানে প্রচ্ছন্ন। ক্ষিপ্ত হাতে ঘুরিয়ে দিল
শাটিন্গ, হ্যাণ্ডেল—মাত্র দু-তিন পাক। মত্ত ক্ষিপ্তের মত বুড়ো জগদল
গর্জ্জ উঠল—পানের দোকানে লাল জলের বোতলগুলো কেঁপে উঠল ঠং
সং ক'রে। হর্নের বিলাপে বাজার মাত ক'রে একটুকরো কাল-বোশেখার
মত জগদল স্ট্যাণ্ড ছেড়ে ভাইনের সড়ক ধরে উপাও হয়ে গেল।

হা, একথানা গাড়ী গেল বটে—পান ঘালা বলল—‘আজব এক চীজ
হায় বিমলবাবুকা ট্যান্ডি।’

এই হ'ল বিমলের নিতাদিনের সংক্ষিপ্ত কন্ডস্ট্রী।

জগদলের বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়াটা বডবদ্ব করেছে। এই বৃকম একটা
সংশয় বিমলের মনে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। সে দেখে আর আশ্চর্য্য হয়—
উদ্ভূত চিলগুলোও বেছে বেছে ঠিক জগদলের মাথার ওপর মলত্যাগ
করে; পথচারী লোকেরা পান গেয়ে হাতের চুগটি নিঃসঙ্কোচে জগদলের
গায়েই মুছে দিয়ে সরে পড়ে। স্ট্যাণ্ডে আরো তো ভালমন্দ সাতাশটা
গাড়ী রয়েছে; তাদের তো কেউ এতটা অশ্রদ্ধা করতে সাহস করে না।
জগদলই বা কার পাকা ধানে এমন মঠ দিল?

ফসিল

জগদল! বিমল আস্তে আস্তে ডাকে। স্নেহে দ্রব হয়ে আসে তার কণ্ঠস্বর। তার সকল মমতা রক্ষাকবচের মত জগদলকে যেন এই সমবেত অভিশাপ আর নিত্য গঞ্জনা থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

—‘কুছ পয়োয়া নেই জগদল। আমি আর তুই আছি।’—একটু সুদর্পিত চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বিমল, বেপরোয়াভাবে বিড়িতে জোরে জোরে টান দিয়ে যেন প্রতিসংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হয়ে নেয়।

ঝড়-ঝঞ্ঝা নিয়ে এক আধটা ছুদ্দিনও আসে, আকস্মিক আধিভ্যাসের মেরামতও থাকে—তাঁই প্রত্যেক গাড়ীই এক আধবার কামাই দিতে বাধ্য। কিন্তু জগদলের উপস্থিতি ছিল সূর্য্যোদয়ের চেয়েও নিয়মিত ও নিশ্চিত। সমবায়সায়ী ট্যান্ড্রিচালক মহলে এ-ও একটা ঈর্ষার কারণ হতে পারে। অস্তুতঃপক্ষে বিমলের তাঁই বিশ্বাস। একটা খুনখুনে বুড়ো যদি দিনের পর দিন অনায়াসে লাফ-ঝাঁপ ডনকুস্তি মেয়ে বেড়ায়, কোন জোয়ান না তাকে হিংসে করে?

জগদলকে নিয়ে এই সহৈতুক গর্বের বিমল ফুলে থাকত সর্ব্বদা। জগদল—তার গত পনের বছরের বিলাস ব্যসনে ছুদ্দিনে নিত্য-সহচর একাগ্র সেবায় তাকে পরিপুষ্ট করে এসেছে। দেব নরসিংহের কাছে কত লোক কত বিচিত্র মানত করে—কত রূপং দেহি যশো দেহি। বিমল ছ’পয়সার ফুল বাতাসা নরসিংহের পায়ের কাছে রাখে, মনে মনে ধ্বনিত হয়—একান্ত প্রার্থনা, সামান্য একটু দাবী। ‘হে বাবা, জগদল যেন বিকল না হয়। এ-বয়সে আর আমায় সঙ্গীহীন করো না বাবা, দোহাই।’

‘লোকটাও একটা যন্ত্র’—বেঙ্গলীক্লাবে আলোচনা হয়—‘নইলে পনের বছর ধরে অহর্নিশ মোটরখ্যান। এ মাহুঘের সাধ্য নয়।’

বিমল নিজেই বলে, পোড়া পেট্রলের গন্ধেও কেমন-বেশ—একটু মিঠে নেশা লাগে।

অযান্ত্রিক

‘আমিও বহু। বেঙ্গলী ক্লাব বলেছে ভাল।’ বিমল খুশী হয়ে মনে মনে হাসে। কিন্তু জগদলও যে মানুষের মতই, এ তত্ত্ব বেঙ্গলী ক্লাব বোঝে না, এইটেই বা দুঃখ। এই কম্পিটিশনের বাজারে—বাজের ভীড়ে—এই বৃড়ো জগদলই তো দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে তুলে দিচ্ছে! আর তেল খায় কত কম। গ্যালানে সাজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরীব—জগদল যেন এটুকু বোঝে।

আরবী ঘোড়ার মত প্রমত্ত বেগে জগদল ছুটে চলেছে রাঁচীর পথে। সবাস্ তাব দম, দৌড় আর লোড টানার শক্তি। কম্পমান স্টিয়ারিং হটলটাকে দুহাতে আঁকড়ে বুক ঠেকিয়ে বিমল পরে রয়েছে। অল্পভব কবছে দুঃশীল জগদলের প্রাণক্ষুন্তির শিহন। কনকনে মাঘী হাওয়া ইম্পাতের ফলার মত চামড়া চোঁছে চলে যাচ্ছে। মাথায় জড়ানো কম্ফোর্টারটা দু’কানের ওপর টেনে নামিয়ে দিল—বিমলের বয়স হয়েছে, আজকাল ঠাণ্ডাফাণ্ডা সহজে কান করে দেয়।

স্বমুখে পড়লো একটা পাহাড়ী ঘাট—এই সুবিসপিত চড়াইটা জগদল কষ্ট চিত্তা বাঘের মত একদমে গৌ গৌ করে কত কতবার পার হয়ে গেছে। সেদিনও অভ্যস্ত বিশ্বাসে ঘাটের কাছে এসে বিমল চাপলো এক্সিলেটর—পুরো চাপ। জগদল পঞ্চাশ গজ এগিয়ে থং থং করে ককিয়ে উঠল। যেন তার বৃকের ভেতর ক’টা হাড় সরে গিয়েছে। উৎকর্ষ হয়ে বিমল শুনলো সে আওয়াজ। না ভুল নয়, সেরেছে আজ জগদল—পিস্টন ভেঙে গেছে।

ক’দিন পরে মাঝ পথে এমনি আকস্মিক ভাবে বেয়ারিং গলে গিয়ে একটা বড় রিজার্ভ নষ্ট হয়ে গেল। তারপর একটা না একটা উপসর্গ লেগেই রইল। এটা দূর হয়তো ওটা আসে। আজ ফ্যানবেন্ট

ফসিল

হেঁড়ে, কাল কারবুরেটারে তেল পার হয় না, পরশু প্রাগণ্ডে
অচল হয়ে পড়ে—শর্ট সারকিট হয়।

এত বড় বিশ্বাসের পাহাড়টা শেষে বুঝি টলে উঠল। বিমল ক'দি-
থেকে অস্বাভাবিক রকমের বিমর্ষ—এদিক সেদিক ছোট্টাছুটি করে বেড়ায়
জগদলের ও নিয়মভঙ্গ হয়েছে—স্ট্যাণ্ডে আসা বাদ পড়ছে মাঝে মাঝে
উৎকর্ষায় বিমলের বুক ছুর ছুর করে। তবে কি শেষে সত্যিই জগদ-
ছুটি নেবে।

—‘না আমি আছি জগদল; তোকে সারিয়ে টেনে তুলবই, ভা-
নেই।’ মোটরবিশারদ পাকা মিস্ট্রী বিমল প্রতিজ্ঞা করলো।

কলকাতায় অর্ডার দিয়ে আনাল প্রত্যেকটি জেনুইন কলকজা। নতুন
ব্যাটারী, ডিস্ট্রিবিউটর, এক্সেল, পিস্টন—সব আনিয়ে ফেললো। অক্লপ-
হাতে স্তব্ধ হলো খরচ; প্রয়োজন বুঝলে রাতারাতি তার ক’রে জিনিষ
আনায়। রাত জেগে খুটখাট মেরামত, পার্টস বদল আর তেলজ-
চলেছে। জগদলকে রোগে ধরেছে—বিমল প্রায় ক্ষেপে উঠল
অর্থাভাব—বেচে ফেলল ঘড়ি, বাসনপত্র, তক্তাপোষটা পর্য্যন্ত।

সর্বস্ব ভেঁ গেল, যাক্। পনের বছরের বন্ধু জগদল এবার খুশী হবে
সেরে উঠবে। খুব করা গেছে যা হোক; এবার নতুন ছড, রাং আ-
বার্নিস পড়লে একখানি বাহার খুলবে বটে।

রাত্রি দুপুরে জগদলকে গ্যারেজে বন্ধ করার সময় বিমল একবার
আলো তুলে দেখে নিল। খুশী উপচে পড়লো তার হৃ’চোখে।—এই তে
বলিহারী মানিয়েছে জগদলকে। ক’দিনের অক্লান্ত সেবায় জগদলে
চেহারা গেছে ফিরে; দেখাচ্ছে যেন একটি তেজী পেশীওয়ালা পালোয়ান—
এক ইসারায় দঙ্গলে ভিড়ে যেতে প্রস্তুত। হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লে
বিমল—বড় পরিশ্রমের চোট গেছে ক’দিন। কিন্তু কি আরামই :

অযান্ত্রিক

লাগছে ভাবতে—জগদল সেরে উঠেছে ; কাল সকালে সগর্জনে নতুন হর্ষের শব্দে সচকিত করে জগদলকে নিয়ে যখন স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াবে বিশ্বয়ে হতবাক হবে সব, আবার জলবে হিংসেতে ।

ইঠাং বিমলের ঘুম ভেঙে গেল । শেষ রাত্রি তবু নিরেট অন্ধকার ।
ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে । বড়ফড় করে উঠে বসল বিমল ।—জগদল
ভিজছে না তো ! গ্যারেজের টিনের ছাদটা বা পুরানো, কত ফুটো
ফাঁটাল আছে কে জানে ! কোন ফাঁকে ইঞ্জিনে জল ঢুকলে হয়েছে আর
কি ! বড়ির নতুন পালিসটাকেও শ্রেফ ঘা করে দেবে ।

হারিকেনটা জালিয়ে নিয়ে গ্যারেজে ঢুকে বিমল প্রায় টেঁচিয়ে
উঠল—‘আরে হায় ! হায় ! ছাদের ফুটো দিয়ে ঝপ ঝপ করে
বৃষ্টির জল ঝরে পড়ছে ঠিক ইঞ্জিনের ওপর । দৌড়ে শোবার ঘর থেকে
নিয়ে এল তার বর্ধাতিটা ; টেনে আনল বিছানার কদল সতরঞ্চি চাদর ।

ইঞ্জিনের ভেজা বনেটটা মুছে ফেলে কদলটা চাপিয়ে দিল—তার ওপর
বর্ধাতিটা ! সতরঞ্চি আর চাদর দিয়ে গাড়ীটার সর্বান্ব ঢেকে দিয়ে
নিজেও ঢুকে পড়ল ভেতরে ; নতুন নরম গদিটার ওপর গুটিস্ফুটি ঘেরে
বিমল শুয়ে পড়ল ; আরামে তার ছ’ চোখে ঘুমান চল এল নেমে ।

পরদিনের ইতিহাস । স্ট্যাণ্ডের উদ্গ্রীব জনতা জগদলকে ঘিরে
দাঁড়ালো—যেন একটা অঘটন ঘটে গেছে । স্বতিমুখর দর্শকেরা দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে দেখল বিমলের অপূর্ণ মিস্ট্রী-প্রতিভার নিদর্শন । বিমল টেনে
টেনে কয়েক বার হাসল । কিন্তু কেমন যেন একটু অস্বস্তি সে হাসি,
একটা শঙ্কার ধূসর স্পর্শে আবিল ।

কেন ? বিমলের মন গেছে ভেঙে । জগদল চলছে সত্যি, কিন্তু
কৈ সেই স্টার্ট মাত্র শক্তির উচ্চকিত ফুকার, সেই দগ্ধিত হ্রেষাধ্বনি আর
দুরন্ত বনহরিণের গতি ।

ফসিল

সহর থেকে দূরে একটা মাঠের ধারে গিয়ে বিমল বেশ করে জগদলকে পরীক্ষা করে দেখল।

—‘চল বাবা জগদল ! একবার পক্ষিরাজের মত ছাড় তো পাখা !’
চাপলো এঞ্জিলেটার ! নাঃ বৃথা, জগদল অসমর্থ।

ফাষ্ট, সেকেন্ড, থার্ড—প্রত্যেকটি গিয়ার পর পর পান্টে টান দিল।
শেষে রাগ চড়ে গেল মাথায়—চল, নইলে মারব লাখি।

অক্ষম বৃদ্ধের মত জগদল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থানিক দূর দৌড়ল !

—‘আদর বোঝে না, স্নেহ বোঝে না শালা লোহার-বাচ্চা, নিজীব ভূত’—বিমল সত্যি সত্যি ক্লাচের ওপর সজোরে দুটো লাখি মেরে বসল।

বিমলের রাগ ক্রমশঃ বাড়ছে, সেই বুনো রাগ ! আজ শেষ জবাব জেনে নেবে সে ! জগদল থাকতে চায়, না যেতে চায়। অনেক তোয়াজ করেছে সে, আর নয়।

রাগে মাথাটা খারাপই হয়ে গেল বোধ হয়। বিমল ঠেলে ঠেলে ভূমনি সাত আটটা পাথর নিয়ে এলো। ঘামে ভিজ়ে ঢোল হয়ে গেল তার থাকি কামিজ। এক এক করে সব পাথরগুলো গাড়ীতে দিল তুলে—একেই বলে লোড !

চল্। জগদল চলল ; গাঁটে গাঁটে আর্ন্তনাদ বেজে উঠল ক্যাচ ক্যাচ করে। অসমর্থ—আর পারবে না জগদল এ ভার বইতে !

এইবার বিমল নিশ্চিন্ত। জগদলকে যমে ধরেছে—এ সত্যে আর সন্দেহ নেই। এত কড়া কল্জে জগদলের, তাতেও ঘুণ ধরল আজ। কৃতান্তের কীট—আর রক্ষে নেই, এইবার দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামবে। শেষ কড়ি খরচ করেও রইল না জগদল।

আমি শুধু রৈছ বাকী—পরিশ্রান্ত বিমল মনে মনে যেন বলে উঠল।

অযান্ত্রিক

—কিন্তু আমরা তো হয়ে এসেছে। চুলে পাক ধরেছে, রগগুলো জোঁকের মত গা ছেয়ে ফেলেছে সব।

—‘জগদল আগে বাবে মনে হচ্ছে। তারপর আমার পালা। যা জগদল, ভাল মনেই বিদেয় দিলাম। অনেক পাইয়েছি, পরিয়েছি, আর কত পারবি? আমার যা হবার হবে।’—যা কোন দিন হয়নি তাই হ’ল। ইম্পাতের গুলির মতোই শুকনো ঠাণ্ডা বিমলের চোখে দেখা দিল ছ’ ঘোঁটা জল।

ফিরে এসে বিমল জগদলকে গ্যারেজের বাইরে বেলতলায় দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল। পেছন ফিরে আর তাকালো না। সোজা গিয়ে উঠোনে বসে পড়ল—সামনে রাখল ছ’ বোতল তেজালো মহুয়া।

একটি চুমুক সবে দিয়েছে, শোনা গেল কে ডাকছে—বিমলবাবু আছ! গোবিন্দের গলা।

গোবিন্দ এল, সঙ্গে একজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক।

—আদাব বাবুজী।

—আদাব, কোন্ গাড়ীর এজেন্ট আপনি? বিমল প্রশ্ন করল। গোবিন্দ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—‘গাড়ীর এজেন্ট নন উনি; পুরানো লোহা কিনতে এসেছেন কলকাতা থেকে। তোমার তো গাদাখানেক ভাঙা এ্যাক্সেল রীমটিন জমে’ আছে। দর বুঝে ছেড়ে দাও এবার।’

বিমল খানিকক্ষণ নিম্পলক চোখে তাকিয়ে রইল ছ’জনের দিকে। ভবিতব্যের ছায়াযুগ্মি তার পরন ক্ষুধার দাবী নিয়ে, ভিক্ষাভাণ্ডটি প্রসারিত করে আজ দাঁড়িয়েছে সম্মুখে। এমনিতে কি হবে না সে, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চাই। বিমল ব্যাপারটা বুঝল।

—হাঁ আছে পুরানো লোহা, অনেক আছে, কত দর দিচ্ছেন?

ফসিল

—‘চোদ্দ আনা মণ বাবুজী’ মারোয়াড়ীর ব্যগ্র জবাব এল।—‘লড়াই লেগেছে, এই তো মোঁকা; ঝেড়ে পুঁছে সব দিয়ে ফেলুন বাবুজী।’

—হাঁ সব দেব। আমার ঐ গাড়ীটাও। ওটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে।

হতভম্ব গোবিন্দ শুধু বলল—সে কি গো বিমলবাবু?

নেশা ভাঙলো এক ঘুমের পর। তখনো রাত, বিমল আর এক বোতল পার ক’রে শুয়ে পড়লো।

ভোর হয়ে এসেছে। থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বিমলের। বাইরের জাগ্রত পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল উপচে একটি শুধু শব্দ বিমলের কানে এসে আছড়ে পড়ছে—ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং। মারোয়াড়ীর লোকজন ভোরে এসেই বিমলের গাড়ী টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলছে।

শোক আর নেশা। জগদলের পাজর খুলে পড়ছে একে একে। বিমলের চৈতন্যও থেকে থেকে কোন অন্তহীন নৈঃশব্দের আবর্তে যেন পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছে অতলে। তার পরেই লঘুভার হয়ে ভেসে উঠছে ওপরে। এরই মাঝে শুনতে পাচ্ছে—ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং—জগদলের সমাধি গনন চলেছে। যেন কোদাল আর শাবলের শব্দ।

দণ্ডমুণ্ড

অনুকূল গোসাই রামপুর জেলের সান্নীহী ।

রামপুর সেন্ট্রাল জেল । এককালে এইখানে কোন জংলী রাজার কেল্লা ছিল । এখন কিন্তু চেনবার উপায় নেই । ডক্ক বাজাবার তোরণগুলি ভেঙে ভেঙে কংক্রীটের গুমটি বসানো হয়েছে । গড়ের পাত ভরাট করে বসানো হয়েছে কলমী আমের বাগান—ল্যাংড়া, কিষণভোগ, হুসেনশাহ আর কালা মানিক । সেকেলে পাঁচিলটা শুধু অটুট আছে এখনও—অজগরের পাকের মত !

গায়ের লোকেরা বলে, ঐখানে ছিল রাজা জরাসন্ধের কারাগার । জেলের ভেতর ছুঁহাত মাটী খুঁড়লে এখনও পাওয়া যায়—শুধু হাড় আর হাড় ।

গেট জমাদার বলে—জেলখানা না কিলখানা ! নতুন কয়েদী এলেই জমাদার একবার হুঁসিয়ার করে দেয়—সামলে খেঁক বাপধন । নইলে ও চেহারা আর কিছু থাকবে না । শ্রেক বনমানুষ হয়ে যাবে ।

রতন কম্পাউণ্ডার বলে—কলির কুস্তীপাক ! বটতলার পাঞ্জিতে ঠিক এই রকম একটা ছবি আছে । বাইরে থেকে যত খুনোখুনি যেন ঝাঁটিয়ে এইখানে জড়ো করা হয়েছে । সমস্ত দিন শুধু পাণী নিয়ে টানা-ছেঁড়া । বেতের মারে রক্ত গড়ায় কোমর ফেটে । ভাতবন্ধ ছর্ব্বন্ত থাবি থায় চোরা কুঠরীতে । চক্কি দিয়ে মাঞ্জা করা হয় ফাঁসীঘরের দড়ি । ছিটের জাঙ্গিয়া পরা নারকীদের ছুরন্ত করা হয় বেণ্টের বাড়ি দিয়ে । এর মধ্যে কারু বিরক্তি, মানি, সাধ অসাধের প্রশ্ন নেই ।

রোগা রোগা ওয়ার্ডার, চিড়িতনের গোলামের মত জবরজং পোষাক । পিট্টিবিছায় কী মজবুত হাত ! বাড়ের মত চড় ঘুসি চালায়—হাতের গাঁট্টাগুলি লোহা হয়ে গেছে ।

ফসিল

কে না ভয় পায় ঐ অফিস ঘরটাকে ? বিশেষ ক'রে পোক্ত শিশু-কাঠের ঐ আলমারীকে । ওপরের থাকে সাজানো প্রচণ্ড প্রচণ্ড ভল্যুম—জেলকোড আর ম্যানুয়েল । নীচের থাকে সারি সারি ফাইল ।

প্রতি দিনের ডাকে কোথেকে ভেসে আসে কতগুলি নিঃশব্দ অক্ষর—জরুরী আর আধাজরুরী অর্ডার । জীবন মৃত্যুর ওলট পালট হয়ে যায় এদিকে । এর নড়চড় হয় না । এখানে আবেদন নিবেদন চলে না । শাস্ত্র বিধানের জাল পেতে বসে আছে নির্বিকার ফাইল-ব্রহ্ম । কয়েদ, সাজা, মুক্তি, চাকুরী, পুরস্কার, পেন্সন, ভাতা ও ছুটি—ভবলোকের যত শুভাশুভ গচ্ছিত ঐ ফাইলের পাতায় পাতায় ।

বেটে মজবুত চেহারার প্রৌঢ় মানুষ অনুকূল গোসাই । পট্ট জড়ানো পা দুটো ছোট এক জোড়া গদার মত । অনুকূলের উগ্র রকমের নিয়ম-নিষ্ঠা, ওর কেতাহরস্তী আচরণের কথা সেপাই মহলে সবাই জানে । উদ্দির পতলের বোতামগুলিতে পালিশ দিতে ভুল হয় না ওর কোন দিন । বুট বেণ্ট চক্‌চক্ করে । লোকটা যেন সারাক্ষণ ড্রিলই করছে । সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্প্রিংয়ের ওপর বসানো । কেউ একটা বিড়ি দিলে বুক চেতিয়ে, বুট ঠুকে, ফোঁজী ঢঙে হাত পাতে ।

ডিউটি শেষ হ'লেও ধুতি পরে থাকতে অস্বস্তি বোধ হয় অনুকূলের । কেমন গ্রাংটো গ্রাংটো লাগে । শরীরটার ওজন নেই মনে হয় । হাঁটতে গিয়ে তাল থাকে না । বুটজোড়া পায়ে চড়িয়ে তবে অনুকূল স্তব্ধ হয় ।

কাউকে হাই তুলতে দেখলেও অনুকূল চটে যায় । বিউগল পড়লেও যে কি ক'রে লোকে আরও আধ মিনিট মটকা মেরে শুয়ে থাকে ! আশ্চর্য্য !

দণ্ডমুণ্ড

মাইনে নেবার দিন, মাসের পয়লায় অম্বকুলের কেতাহরস্তীর পরাকাষ্ঠা জেগে ওঠে। প্যারেডে প্রাইজ পাওয়া গোটা দশেক মেডেল বকের ওপর পিন দিয়ে ঝুলিয়ে, ফিটফাট উর্দি বুট বেন্ট পট্টর সাজ পরে, স্কালুট দেগে ক্যাসিয়ার বাবুর কাউন্টারে এসে দাঁড়ায়। আঠারটা টাকা হাতে তুলে ছ'পা পিছিয়ে আবার স্কালুট দেয়। শরীরটাকে এবাউট-টার্ণে একটা লঘুললিত মোচড় দিয়ে তাল মেপে পা ফেলে চলে যায়।

দোসরা তারিখে কাটায় কাটায় বেলা বারটায় মনিঅর্ডার করে আসে আটটা টাকা—শ্রীমতী নয়নতারা দেবী, ঝালদা, মানভূম। কুপনে বউকে একটা ছত্রে কুশল জিজ্ঞাসা করে। সমস্ত মাসে শুধু এই একবার। অতি কষ্টে লিখতে হয় অম্বকুলকে। বন্দুক-ঘাঁটা কড়া-পড়া ভোঁতা আঙুলে কলম আর চলে না।

বাইরের এই আচরণের মত অম্বকুলের মনের ভেতরেও একটা ক্রুর রকমের সততা। পেটান লোহার পাতের মত কঠোর। সরকারী গাছের একটা এঁচোড় খেতে হ'লেও অম্বকুল দরখাস্ত করে—গ্রাফ্য দাম দিতে চায়। আইন কানুনই ওর আত্মা। চাকুরীই সর্বস্ব। আঠার আনা মাইনে দিলেও বোধ হয় সাস্ত্রীগিরি ছাড়তে পারবেনা।

বেড়ীপরা কয়েদীর পাল চরিয়ে ওয়ার্ডারেরা বাইরের ফার্মে নিয়ে যায়। থৈনি টিপে খোসগল্প ক'রে, আর ল্যাকপ্যাক ক'রে হেঁটে চলে সব। অম্বকুল আচমকা হুকুর দেয়—ফল্ ইন্!

হাঁকের দাপটে অপ্রস্তুত ওয়ার্ডারেরা লাইন বেঁধে ফেলে। এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে গাল দেয়—শালা কোথাকার জেনরেল যেন!

আই জি সাহেবের ড্রাইভার জেল ফটকে বসে ছিল। তাড়ির নেশাটা

ফসিল

মাথার ভেতর একটু ছোরে চাগিয়ে উঠতেই একটা গজল ধরলো গলা ছেড়ে। অন্তকূল নিঃসঙ্কোচে তার ঘাড় ধরে ফটকের বাইরে পার করে দিল। ঠিক এমনি নিঃসঙ্কোচে সে ঘাসথেকো গাধাগুলোকে ফুল-বাগান থেকে কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে ফটক পার করে দেয়।

সেপাইরা আর ওয়ার্ডারেরা অন্তকূলের ওপর মনে মনে চটা। ওর মত অষ্টপ্রহর পণ্টন সেজে মানুষে থাকতে পারে কি? তাছাড়া—ভেতর থেকে একটা পুরনো কবুল, এক টেলি গুডও বাগিয়ে আনার উপায় নেই। অন্তকূলের চোখে পড়েছে কি চুগলি হয়ে গেছে জেলারবাবুর কানে।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। খালাস-পাওয়া কয়েদীরা গেট-জমাদারের পায়ের ধূলো নিয়ে হাসিমুখে মোটর বাসে চড়ে। পিত্তি জলে দাশ অন্তকূলের। মনে মনে এই জিজ্ঞাসাই ওকে অস্তির করে তোলে—চোটাদের যদি ছেড়েই দিতে হয়, তবে কেন এতদিন ধরে পোষা—এত হয়রানি! বলিহারি নিয়ম।

হাবিলদার বিমর্ষ হয়ে বলে—বউয়ের চিঠি এসেছে। ছেলেটা বড় বেয়াদবি আরম্ভ করেছে। রাত্তিরে লোকের বাগান ভেঙে বেড়ায়—ছুটো আম লিচুর লোভে। কবার ধরা পড়ে মারধোর খেয়েছে।

অন্তকূল বলে—যাও, বাড়ী গিয়ে এই বেলা ভালয় ভালয় ছোঁড়ার হাত দুটো কেটে দিয়ে চলে এস।

লক্ষণ ছুবে বলে—ভাইটা অবাধ্য হয়ে উঠেছে! স্কুলে দিয়েছি, পয়সা খরচ করছি। এদিকে সমস্ত দিন মেলায় জুয়ো খেলছে।

অন্তকূল বলে—দিনের বেলায় ইন্টের ভাঁটায় কাজে লাগিয়ে দাও, বার

দণ্ডমুণ্ড

দণ্ডা কাদা ঠাসবে। আর রাত্তিরে মাহাতোদের ভাঁড়ারে জাল দেবে
আখের রস। ভোর পর্যন্ত ছিব্ড়ে ঠেলবে উত্তনে।

মতি হালদারের ছেলে, এখনও বর্ণপরিচয় শেষ করেনি। পায়খানায়
বসে বিড়ি টানে। অন্তকূল সমাধানের প্রস্তাব করে—একটা বিড়িতে
ভাল করে কাঁচা গু মাথিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিও একদিন। টিট হয়ে যাবে।

ওয়র্ডারদের ভাঙের বৈঠকে আলোচনা হয়—ধর, অন্তকূল যদি জুজ
হতো।

—ওরে বাবা। প্রায় একসঙ্গে সকলে আংকে ওঠে। ছাতুচোরেরও
দাঁসি হতো তাহ'লে।

লক্ষণ ছবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে—পেন্সন নেবার পর অন্তকূল বড়
জোব এক ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারবে।

বহুরাস্তে একবার ছুটি নেয় অন্তকূল—এক মাসের জগ্মে। কিন্তু
এমনই ছুঁতগ্য, দশটা দিনও দেশে কাটাতে পারে না।

সামন্তবাবুরা এসে বলেন—তুমি কেমন হে অন্তকূল! আঠার টাকা
মাইনেতে বিভূঁয়ে পড়ে রয়েছ। সঙ্কীর্ন উঁচিয়ে, ভট বুট করা কি তোমার
সাজে? তোমার বাবা ছিলেন আচায়া মানুষ। চলে এস আমাদের
কাছারীতে, তসিলদারী করবে।

অন্তকূলের শালা এসে অনুরোধ করে—কি করছো দাদা! আজ
হোল বছর চাকরী করে ক'টা কড়ি জমিয়েছ বলতো? ঘরের দেয়াল যে
বসে গেছে। দেশে বসে তসিলদারী, হোলই বা পনের টাকা। বিদেশের
পঞ্চাশ টাকার সমান।

সব গোলমাল করে দেয় নয়নতারা।—তসিলদারী করলে কি ছোট
হয়ে যাবে তুমি? পনের টাকা মাইনে তো ফালতু দক্ষিণে। চাল তেল

ফসিল

হুন্ থেকে স্ক্রু করে আম কাঁঠাল পর্যন্ত আর কিনে খেতে হবে না। দেখছো তো বৈকুণ্ঠ তসিলদারের নতুন বাড়ী—রাণীগঞ্জের টালি দিয়ে চাল ছেয়েছে।

বাস, এইটুকুই যথেষ্ট। সেদিনের সন্ধ্যার ট্রেনেই অন্নকূল বিদায় নেয়। গরম ছাইরঙা মিলিটারী সোয়েটার গায়ে চড়িয়ে, কাপড়চোপড় পুঁটলি করে পিঠে ঝুলিয়ে, ভারি বুট দিয়ে স্ট্রিটের আল মাডিরে স্টেশনের পথ ধরে।—এমনি অন্ধকারে তারাভরা আকাশের নীচে, রাইফেল হাতে রামপুর জেল ফটকের ডিউটি। রাত্রির পৃথিবীর রাজ্য দণ্ডমুণ্ডের মালিক অন্নকূল। সেখানে তার চ্যালেঞ্জের ইঁাকে অন্ধকার কাঁপে, কমিশনার সাহেবের গাড়ী থেমে যায়।...আর তসিলদারী! থু থু ফেল এমন চাকরীর কপালে। চাকরী না চুরি? শালা সামন্ত!

আজকের রাতটা ভয় করার মতই। অন্ধকারটা যেন আজ হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় এমনই নিরেট। ঝাড়ের আলোতে জেলফটকের গরাদ-গুলো চক চক করছে অতিকায় হাঙ্গরের দাঁতের মত। অন্নকূল সান্থী ডিউটিতে দাঁড়িয়ে সামান্য এক-একটা শব্দে অযথা চমকে উঠছে। অনেক-দিন আগে এই রকম একবার হয়েছিল। সেদিন মা মারা গেছেন।

ফটকে পাহারা দিচ্ছে অন্নকূল। আজ এই স্তম্ভিত চরাচরের সমস্ত পাপ পুণ্যের একমাত্র প্রহরী অন্নকূল। কাঁকরগুলো তেতে আছে ফুটন্ত তেলের মত। এক-একটি পদক্ষেপে ভারি বুটের স্পর্শ যেন আওয়াজ করছে—ছ্যাঁক ছ্যাঁক ছ্যাঁক। এই শব্দে যত উত্ততফণা অপরাধের সাপ যেন সভয়ে মুখ লুকিয়ে ফেলবে গর্তের ভেতর। হঠাৎ একটা দম্কা হাওয়া গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেল। বেয়নেটটা ক্রমাল দিয়ে মুছে নিয়ে আবার সহজ হয়ে নিল অন্নকূল।

দণ্ডমুণ্ড

গুণটির ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুকূল একটু মুসড়ে পড়ছে। মুঠোর ভেতর থেকে আলগা হয়ে হেলে পড়েছে রাইফেল। একবার কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে অনুকূল আবার পাযচারী স্তব্ধ করলো। অনেকক্ষণ অন্ধকারে চোখ দুটোকে চুবিয়ে নিয়ে ভাল করে তাকালো সামনের দিকে। এইবার একটু ফাঁকা হয়েছে যেন। পাকুড় গাছটা দেখা যায়, জেল কম্পাউণ্ডের একেবারে শেষে, খাস সড়কের গা ঘেঁসে। যাক, তবু টর্চটা আনতে ভুল হয়নি আজ।

এখন তো শেষরাত্রি। অগুদিন ছাঁচারটে শেয়াল ছোটাছুটি করে। গাছে গাছে বাছড়ের উৎপাত চলে। বটফল ঝরে পড়ে টপ টাপ। আজ সবাই চক্রান্ত করে বয়কট করেছে। অনুকূল আবার ঝিমিয়ে পড়লো।

হাঁটুর ওপর একটা মশা কামড়াচ্ছে। অনুকূল সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে একটা চড় বসিয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। চড়ে শব্দে তবুও গুণমোট যেন হাল্কা হলো পানিকটা।

মচ মচ! মচ মচ! ভারি বুটের আওয়াজ। রাইফেলটা কাঁপে তুলে অনুকূল টান হয়ে দাঁড়ালো। একটা টিম টিমে আলো ছলতে ছলতে আসছে। অনুকূল চিতাবাঘের মত থাবা পেতে অন্ধকারে মিশে রইল অসাড় হয়ে!

...হল্ট, হুকমসদার! অনুকূলের গলাফাটা চ্যালেঞ্জে একজোড়া পেঁচা উড়ে পালিয়ে গেল পাকুড় গাছের কোটির থেকে।

. —পাস ফ্রেণ্ড অলসোয়েল।

রাউণ্ডে বেরিয়েছে হাবিলদার। সামনে এগিয়ে এসে বললো—ঠিক হায়! আজ একটু চট্ট পট্ট থাকবে। আর রাত বেশী নেই। সাহেবর। এল বলে।

ফসিল

হাবিলদার চলে গেলে আবার সেই অন্ধকারের নেশা। গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে অকারণে। এমন তো কোন দিনই হয় না। পাগলা ঘন্টি বাজবে নাকি আজ!

মুখের ওপর একটা শীতল কঠিন স্পর্শ। গুমটির গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল অন্ধকূল। রাইফেলটা হেলে পড়েছে। স্তম্ভন বেয়নেটটা ছোট ছেলের ঠাণ্ডা গালের মত লেগে আছে মুখের ওপর। অন্ধকূল পড়কড় করে উঠলো।

পাকুড় গাছের তলায় কিছু একটা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারের চেয়ে আরও ভরাট মিশমিশে চেহারা। কে ও?

চ্যালেঞ্জ করবে কি না ভাবছে অন্ধকূল। চেপে গেলে চলবে না। সিঁদেল শালারা এই রকম তেল ভুসো মেখেই আসে। কোন্ ফাঁকে কি হয়ে যায় বলা যায় না।—হন্ট হুকমদার। বুট ঠুকে হাঁক ছাড়লো অন্ধকূল—তার ননের সমস্ত ত্রাস যেন আওয়াজে থর থর করে উঠলো।

কোন উত্তর, সাড়া শব্দ নেই। শুধু রক্তজবার হাসির মত এক টুকরো লাল ছাতি দপ্ করে ফুটে উঠলো অন্ধকারের বুকে—পাকুড় গাছের নীচে। একটা অগ্নিমুখ ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে নিথর হয়ে।

দাঁতে দাঁত চেপে রাইফেলটা তুলে অন্ধকূল এগিয়ে এল। কান দুটো তেতে উঠেছে। এইবার ঘোড়া দেগে ফেলবে। একটি ফায়ারে ছেঁদা হয়ে লুটিয়ে পড়বে ঐ ছায়াশরীর, যেই হোক সে। বিকার বোঁগীর মত উত্তেজনায় মোচড় দিয়ে উঠলো অন্ধকূল। ঘোড়া থেকে হাতটা তুলে দাঁতে চেপে রইলো নিজেরই আঙুল। কিছুক্ষণ মাত্র!

গুমটির ভেতর থেকে হুকে ঝোলানো টর্চটা নিয়ে এক পা ছ'পা করে এগিয়ে চললো অন্ধকূল। মূর্তিটা তবু পালাবার নাম করে না—শঙ্কাহীন

দণ্ডমুণ্ড

স্থৈর্য্য সমাশীন। গজ দশেক দূরে দাঁড়িয়ে অল্পকূল টর্চের বোতাম টপলো। পাকুড়তলা বালসে উঠলো আলোয়।

মনের স্থখে গাঁজায় দম দিচ্ছে পাগলটা। খুব বুড়ো একটা পাগল। কোমরে নেংটা আছে বলেই উলঙ্গ বলা যায় না। উটের পায়ের গাঁটের মত হাঁটু আর কলুইয়ের থাবা থাবা কড়া। অন্ধক পিঠ জুড়ে একটা পুরু মাদের আচ্ছাদন। জটপড়া পাকা চুলে সমস্ত মাথাটা ঠাসা।

রাগে কঁচকে উঠলো অল্পকূলের মুখ। রাইফেলের কুদো দিয়ে পাগলের কোমরে সজোরে একটা ঘা জমিয়ে দিল—শুকনো কাঠের ওপর গাড়ির আঘাতের মত খটাস্ করে একটা কাটা আওয়াজ। রুপ করে পড়ে গেল পাগল শুকনো পাতার স্তূপের ওপর।

অল্পকূল ততক্ষণে রাগ সামলে নিয়েছে। গাঁজার কলকেটা কেড়ে হুড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের পিঠে বেয়নেটের ছাঁচালো মুখটা আন্তে চেপে ধরলো।

—ওঠ! পাগল তবু নিকরিকার। শকুনির মত নথ দিয়ে পিঠের দাদ ঢংকোচ্ছে সে।

আর একটু জোরে চেপে অল্পকূল বললো—দেখচিস ঐ ফটক। যেতে পার, বল?

আঙুনে পোড়া সাপের মত তিড়িবিড় করে লালিয়ে উঠলো পাগল। মোজা দৌড় দিল মরিয়া হয়ে। ভূতের ছায়ায় মতই মিলিয়ে গেল সড়কের অন্ধকারে।

এতক্ষণ পরে তবু একটা এ্যাকশন হলো। অল্পকূল হাসলো মনে মনে—একটু সামান্য বেয়নেটের খোঁচা, বাস্। কি রোগ না সারে অস্ত্র চিকিৎসায়? ফোড়া থেকে পাগলামী পর্য্যন্ত।

আবার ডিউটির নেশা জমে উঠেছে। মার্চের সঙ্গে দৃষ্টি ঘুরছে দশ

ফসিল

দিকে। হাতের মুঠো ঘেমে পেছল হয়ে উঠেছে। ফুঁ দিয়ে হাত শুকিয়ে নিয়ে কাঁধ বদল করছে রাইফেল—ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে।

পাপ আর পুণ্য রাজ্যের মাঝখানে, সীমান্তের আলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে অম্বুকুল—অতন্দ্র সেন্সরের মত। সমস্ত রাত আকাশেও যেন একটা তোলপাড় চলেছে। দূর ঝিলের ওপর খসে পড়ে বড় বড় তারা—সাবধানী সান্দ্রীদের বুলেট ছুটছে সেখানে।

গুমটির কাছেই আমগাছটায় ঝাঁঝের কীর্তন আরম্ভ হলো একসঙ্গে। একেবারে কানের কাছে। মাথা ধরে উঠলো অম্বুকুলের।

ওখানে আবার কে? টেনিস্ কোর্টের কাছে, কাঠগোলাপের ঘেরানের পাশে? নিশ্চয় মালীদের ছোঁড়ারা। সাবাস্ দুঃসাহস। ক’দিন আগেই করবী গাছটাকে একেবারে নেড়া করে সমস্ত ফুল সাবড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু বাটারা বেকুব—সাদা কাপড় পরে এসেছে চুরি করতে। দফা সেরেছি আজ শালাদের। হাত-পা বেঁধে শোরের মত ফেলে রাখবে আজ—হিম থাওয়াবো সমস্ত রাত। তারপর হাজতের মশা।

পা টিপে টিপে এগিয়ে টর্চ টিপলো অম্বুকুল।

মালীর ছেলেরা কেউ নয়। ভুঁড়ো শেয়াল একজোড়া। একট বিষঘায়ে পচা কাটা-পা কুড়িয়ে এনে, জড়ানো ব্যাগেজটা খুলছে টানাটানি করে। আইডোফরমের ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাসে কাঠগোলাপের মিঠে গন্ধটুকু মারা পড়েছে।

—ধুর! ধুর! শেয়াল দুটোকে তাড়িয়ে দিয়ে অম্বুকুল ফিরে এল ফটকের গুমটিতে।

প্যারেডের মাঠে আবার কারা? না, বার বার চোখের ভুল নয়! বেশ স্পষ্ট। এগিয়ে এসে অম্বুকুল মাঠের একটা পোষ্টের কাছে দাঁড়ালো।

দণ্ডমুণ্ড

টুং টুং মিঠে চুড়ির শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে অন্তকূল শুনলো সে আওয়াজ,
না মিথ্যে নয়। ছি ছি, কি নির্লজ্জ দুঃসাহস! এ যে প্যারেডের মাঠ,
জেল এলাকা। সতর্ক দৃষ্টি রেখে অন্তকূল চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ, তবু তারা যায় না। অন্তকূল বিমনা হয়ে গেছে।—

আজকের এই অন্ধকারে হৈমন্তী হিমের রোমাঞ্চ। কুয়াশায় কস্তুরী
নেশার বিফলতা। অলজ্জ বাহুপীড়নে যৌবন বিলিয়ে দেবাব মত এই
শক্ত মাটির উপর ভেজা ঘাসের বিছানা। কত দিনেরই বা কথা—বিয়ের
আগে, তখন নয়নতারা কতই বা বড়—ঝালদার মেলার ভীড়ে খোঁপা
টেনে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া……।

চমকে উঠলো অন্তকূল। আজ গুলি খেয়েছে নাকি সে। ডিউটাতে
দাঁড়িয়ে এসব ছেলেমানুষি চিন্তা। নিজের ওপর রাগ হলো অন্তকূলের।
হোক কেলেঙ্কারী, আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। ওদের ধরতেই হবে।

টর্চ টিপলো অন্তকূল। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বোকার মত সটান
গুমটিতে কিলে এসে দাঁড়িয়ে রইল।—জেলমুদী রাম শেঠের কুস্তি বিলি,
গলার বকলেসে ঘুন্টি বাঁধা। আর একটা গোত্রহীন পথের কুকুর।
বিলির ঘুন্টি থেকে থেকে অন্ধকারে বাজছে—ভাগিনী অভিসারিকার
নপুণের মত।

মোটরের হর্ণের চাপা গম্ভীর আওয়াজ। হেড লাইটের আলো
ধমকেতুর লেজের মত ছড়িয়ে পড়েছে সড়কের ওপর। ছোটো গাড়ী গোঁ
গোঁ করে এসে দাঁড়ালো ফটকের কাছে।

সাহেবরা এসেছে। জেলারবাবু, ডাক্তার আর কম্পাউণ্ডার
এসেছে। ঘুমভরা চোখ—নিশির ডাকে ঘর ছেড়ে হঠাৎ বেঘোরে চলে
এসেছে সব।

সাদা শব্দ নেই কার্ফ মুখে। বড় জমাদার ফটকের কুলুপ খুলছে।

ফসিল

গরাদআটা ছোট লোহার দরজাটা কঁকিয়ে কঁকিয়ে ফাঁক হয়ে আব-
বন্ধ হলো।

—ওঃ হো! আজ গোপী দোসাদের ফাঁসি!

সমস্ত জড়তা মুহূর্তে উবে গেল। চিড়িয়াখানায় খাচার পোষা বা-
মত লাফিয়ে ঘুরে ফিরে একটানা পায়চারী আরম্ভ করলো অনুকূল।

কার্তিক মাসের রাত, তার ওপর কুয়াশার ঘোর। ফসী হতে
অনেকক্ষণ। শিশিরের ফোঁটা ঝরে পড়ছে বটপাতা থেকে। ফটকের
কার্শিশ হিমে ভিজে উঠেছে। এখনও কাকের রা নেই, নেশা করে ঘেঁ-
ঘুমিয়ে পড়েছে সব। আজ সমস্ত পৃথিবীর ওপর একটা কালাপানি-
বাম্প থমকে রয়েছে।

—হন্ট, হুকমসদার! অনুকূলের চ্যালেঞ্জ আছড়ে পড়লো স্তব্ধ
অন্ধকারের ওপর। বিভীষিকা ভেদ করে হনহনিয়ে ফটকের দিকে
বেপরোয়া চলে আসছে কে? অনুকূল তাক করার জন্যে রাইফেল
ওঠালো। কিন্তু না, একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

—আমি গোপীর মা!

বুড়ী আর তার সঙ্গে বছর চারেকের ছাংটো একটা ছেলে বুনে
বেড়ালের মত তুড় তুড় করে এগিয়ে এল।

ফটকের আলোতে নিয়ে গিয়ে অনুকূল বুড়ীর হাতের সার্টিফিকেটট
দেখে নিল। বুড়ী লাস নিতে এসেছে সংকারের জন্য।

—আয় হাবা। আঁচল দিয়ে হাবাকে আর নিজের নাক পর্যন্ত
ঢেকে, চোখ ছোটো শুধু খোলা রেখে বুড়ী থাম ঘোঁসে বসে রইল।

ডিউটীর পিনিক চড়েছে অনুকূলের মাথায়। তাঁতের মাকুর মত
মার্চ জমিয়েছে কঁাকরের ওপর।

দণ্ডমুণ্ড

—কত দেৱী হবে সেপাই বাবা ?

অনুকূল বুড়ীৰ প্ৰশ্নে তাকিয়েও দেখলো না। বুড়ী কিন্তু উসখুস
কৰছে কথা বলার জন্তে।

—এই হাবাট হলো গোপীৰ ছেলে। আমার এই একটা নাতি।

অনুকূলেৰ কানে ভৌ ধৰে গেছে তখন। বাৰণেৰ চিতাৰ শব্দটা হু হু
কৰছে। পালা জ্বৰেৰ মত হাত পায়ে জমাট ডিউটিব জ্বালা ধৰে গেছে !

—ছেলেৰ মৰ্যোও আমার এই একটি, গোপী।

এতক্ষণে কাক জেগেছে। কৰ্মা হয়ে গেছে। নূৰেৰ পাচিলেৰ গুমটিৰ
ওপৰ আলো গুলো বাপসা হয়ে গেছে জলভবা চোখেৰ মত। জ্বলেৰ
ভেতৰ ঘুমভাঞ্জনো বিউগল বেজে উঠেছে ভাঙা গলায়। ফটক খুলে
ঝাড়ু বালতি নিয়ে মেথৰেৰা বেকুছে একে একে। মোটৰ গাড়ী ছটো
হৰ্প দিয়ে মোড় কিৰলো পাকুড় গাছেৰ কাছে—বড় সড়কে।

অনুকূল শাস্ত হয়ে দাডালো।

অনেকে এসে গেছে। লাইন বেধে দাঁড়িয়ে গেছে গুৱাৰ্ভাৰেৰা।
শবিলদাৰ এসেছে। কম্পাউণ্ডাৰবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। আর...

পাটিয়াৰ ওপৰ শোয়ানো আছে, নাদা মলমলে ঢাকা গোপী
দোসাদেৰ লাস—মৰা কুমীৰেৰ মত। বুড়ী পাটিয়া ছুঁয়ে বসে আছে।
হাবা ঘূৰ ঘূৰ কৰছে এদিকে ওদিকে।

কুমীৰেৰ মত কেন ? অনুকূলেৰ মনে পড়লো ছেলেবেলায় দেখা
মামাবাড়ীৰ একটা ঘটনা। রূপনাৰায়ণেৰ খালেৰ একটা কুমীৰ তিল
ক্ষেতে উঠে পড়েছিল ভুল ক'ৰে। গাঁয়েৰ লোকেৰা তাকে পিটিয়ে
পিটিয়ে মেৰে এমনিভাবে সটান শুইয়ে রেখেছিল ক্ষেতেৰ ওপৰ।
আগুৰিদেৰ বিধবা ছোটবৌকে কিছুদিন আগে অনেক খুঁজেও পাওয়
যায়নি। নিশ্চয় তাকে খেয়েছে এই শালা কুমীৰ।

ফসিল

কম্পাউণ্ডার বললো—মিছেই এলি বুড়ি। লোকজন কৈ তোর ?
নিয়ে যাবি কি ক'রে ?

—জাতের কেউ এল না। রোগে ত আর মরেনি। রাজী হলো না
কেউ ছুঁতে।

—কিছু টাকা খসালেই আসতো।

—তাও সেধেছিলাম। তবুও এল না।

একটু ভেবে নিয়ে কম্পাউণ্ডার বললো—কি জাত ?

—রবিদাস বাবা !

—আচ্ছা, বার কর টাকা। এখুনি জাত জোগাড় করে দিচ্ছি।

বুড়ী কি যেন হাতড়াচ্ছে, আঁচল ঢাকা থাকায় বোঝা যাচ্ছে না।
হাবিলদার আর ওয়ার্ডারেরা এগিয়ে এল। সকলের চোখে যেন লাল
ঝরে পড়ছে। দুটো মেথর কাজ ভুলে বসে পড়লো সেইখানে।

হাবিলদার কম্পাউণ্ডারের কানে কানে বললো—বেশ কিছু এনেছে
বুড়ী।

—গ্যাংগের গোদা, কিছু তো রেখে গেছে নিশ্চয়।

ক'টা টাকা বের করতে বুড়ী দেয়ী করছে বড়। হয়তো তোড়ার
গেরো খুলতে পারছে না। ওয়ার্ডারেরা অল্পকূলের দিকে আড়চোখে
তাকিয়ে নিয়ে বললো—তুমি বাবা ঐ দিকেই থাক। চুগলিবাজ !

কম্পাউণ্ডার বললো—নে বুড়ী, একটু জলদি কর।

—এই নাও। একটা ময়লা রূপোর হাঁসুলী বার করে সামনে ধরলো
বুড়ী।

বুড়ী হাঁপাচ্ছে, গায়ের আঁচল পড়ে গিয়ে গলার দাগটা দেখা যাচ্ছে।
হাঁসুলীটা খুলতে গিয়ে টানা হেঁচড়ায় ছড়ে গেছে খানিকটা।

অপ্রস্তুত হাবিলদারের গৌফ ঝুলে পড়লো, বেকুবের মত কেঠো

দণ্ডমুণ্ড

হাসি হেসে তাকালো কম্পাউণ্ডারের দিকে। মেথর ছোটো মুচকি হেসে দৃগ ফিরিয়ে নিল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে কম্পাউণ্ডার বললো—ওটা রেখে দে বুড়ী। ওতে কিছু হবে না।

সকলেই একটু নিঝুম হয়ে গেছে। হাবিলদার হঠাৎ গর্জে উঠলো।
—আঃ, এই বুড়িয়া, হাত সরা শীগগির। চোখের সামনে কি করছে দেখ।

মলমল কাপড়ের ঢাকাটা একটু সরিয়ে গোপীর মাথায় হাত বুলোচ্ছিল বুড়ী। ধমক খেয়ে হাত সরিয়ে নিল।

অনুকূলের পাহারা শেষ হতে খুব বেশী দেরী নেই। কি ভেবে সে'ও এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

কম্পাউণ্ডার ব্যস্ত হয়ে বললো—বিপদে ফেলেছে বুড়ী। গাস দরবার নাম করে না। এইবার ভেপসে গন্ধ ছাড়বে। অগত্যা..

কম্পাউণ্ডার বিড়ি ধরিয়ে আরম্ভ করলো—তুমি তে! শোননি অনুকূল গোসাই, কটা দিন কী উৎপাতই করলো এ ব্যাটা দোসাদ। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ইস্!

বড় জমাদার—বড় ভারি ডাকু ছিল বুঝি?

—ওরে বাবা! ভাগ্যিস সেদিন মিলিটারীর গাড়ী পৌছে গেল সময় মত, নইলে প্রাণ নিয়েছিল সেবাত্রা। মহারাজগঞ্জের সড়ক ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরছি চাতরা থেকে। নদীর পুলটার কাছে এসে দেখি পথে পড়ে আছে ছোটো গাডোয়ানের লাস। টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে নারা হয়েছে। গাড়ীর আটা ঘি সব লুটে নিয়ে গেছে। অর্ধেক ছড়িয়ে পড়ে আছে রাস্তার ওপর।

ফসিল

ওয়ার্ডারেরা বললো—ও কি ভেবেছিল পৃথিবীটাকে ? আইন নেই ? সাজা নেই ? মালিক নেই ?

বিড়িতে জোরে টান দিয়ে কম্পাউণ্ডার বললো—সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল পুলের কাছে সেই মন্দিরটার দশা দেখে ! ক’হাজার বছরের পুরণে মন্দির—জঙ্গলটাকে কত পবিত্র করে রেখেছিল। আজ পর্য্যন্ত কলের প্লেগ নদী পার হয়ে এদিকে আসতে পারেনি। সে ঐ মন্দিরের বিগ্রহের মহিমা। দেখলাম, এই মন্দিরের কপাট ভেঙে অমন সুন্দর নওলকিশোরের রূপের চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে গেছে।

—চণ্ডাল ! চণ্ডাল ! ফাঁসিতে কি হয়েছে ওর ? একে ধরে হাবিলদার বুড়ীর দিকে মারমুদ্রি হয়ে তাকালো।

কম্পাউণ্ডার—তারপর, লুট করবি তো কর, গরুর গাড়ী দুটোতে আগুন লাগালি কেন ? আমরা যখন পৌছেছি, তখন একটা গরু বলসে নরোই গেছে আর বাকীগুলো ছটফট করছে তখনো।

ওয়ার্ডারেরা একসঙ্গে প্রায় গ্লেপে চৌচিয়ে উঠলো—মুতে দাও পাপীন্দ্র লাসের ওপর। কুকুর দিয়ে মৃত্যিয়ে দাও।

কম্পাউণ্ডারের বিড়ি শেষ হয়েছে।—কিন্তু বাবা, পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে। এখন টের তো পেলো ? দাঁড়কাকে ঠুকরে খাবে যে এইবার !

হঠাৎ পচা মছয়ার গন্ধে বাতাসটা সিঁটকে উঠলো। টলতে টলতে আসছে হরি—ফাঁসিঘরের ডোম। হাতে একটা বড় মেটে সাবান, কোমরে নতুন তোয়ালে জড়ানো।

—একি ? বেড়ে সব বসে বসে শবসাধনা করছ ! লাস সরেনি এখনো। বড় সাহেবের জুতোর ঠোকর আছে কপালে।

একজন ওয়ার্ডার বললো—হরিয়া, ঐ দেখ।

দণ্ডমুণ্ড

—কি ?

আর একজন ওয়ার্ডার আঙুল তুলে হাবাকে দেখিয়ে দিল।

হরি—ওটা কে ?

কম্পাউণ্ডার—গোকুলে বাড়িছে যে !

বড জমাদার—গোপীডাকুর ছেলে !

হাবা নিজের মনে কাকর নিয়ে খেলছিল। হরি হাততালি দিয়ে আদর করে ডাকলো—আয় ! আয় ! আয় বেটা মেরা।

হাবা দৌড়ে এসে হরির কোলের ওপব লাফিয়ে চড়ে বসলো। হাবার গলোমাথা পাছাটা হাত দিয়ে পরিস্কার করে দিয়ে হরি বললো—জলদি বড হ বেটা। আমার পেন্সনের সময় হয়ে আসছে। তোকেই বসিয়ে যাব আমার গদিতে। আর তো উপযুক্ত কাউকে দেখছি না।

কাকর মনে নেই যে অন্তকূল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্তকূল—চোখের তাবা ছুটো তার পাখব হয়ে গেছে যেন।

কম্পাউণ্ডার অন্তকূলকে আড় চোখে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বুড়ীকে প্রশ্ন করলো।—তোর গোপী এ পথে এল কেন বুড়ী ? সামলাতে পারিসনি ?

আপত্তি করলো হরি—কেন মিছে গল্প জমাচ্ছ কম্পাউণ্ডারবাবু।

ডাকাতের গল্প। সকলে শুনতে চায় সেই রক্তবীজের কাহিনী—মহারাজগঞ্জের জঙ্গলের নরশার্দ্দল। লুট, রাহাজানি, নরহত্যার ঐনির্ভীক অবতার গোপী দোসাদের গল্প। এখনও কুয়াসা সরেনি। পৃথিবী জাগে নি। শেষ ঘুমের দুঃস্বপ্নের মত শোনাবে ডাকাতের জীবন কথা।

—বল বুড়ী বল ! ওয়ার্ডারেরা সকলেই উৎসুক ও উদ্গ্রীব হয়ে ছকুম জানালো।

ফসিল

বুড়ী আরম্ভ করলো—ছেলেবেলা থেকেই বড় পেটুক ছিল আমার গোপী ।

হেসে উঠলো সকলে—এই সেরেছে ! ভারি কথা শোনাতে । পেটুক কে না পৃথিবীতে ? তা বলে সবাই তো আর ডাকাত হয় না বুড়ী ।

—ছেলেবেলাতেই একবার চিলের মাংস খেয়ে কলেরা হয়েছিল গোপীর । সে-যাত্রা ভগবান বাঁচিয়ে দেয় ।

আরও জোরে হাসির হরুরা উঠলো ।—হ্যাঁ এইবার বলেছে বটে । ডাকাতের ছেলেবেলা—চিলের মাংস খাবে, পিশাচে পাবে, তবে তো ।

—হ্যাঁ বাবা, সত্যি একবার পিশাচে পেয়েছিল ওকে ! ওঝা ডাকিয়ে অনেক ঝাড়ালাম । কিছুই হলো না । গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেল গঞ্জে ।

হাবিলদার—চাকরী করতে না চুরী করতে ।

—ভিক্ষে করতে । সমস্তদিন হালুটকরের দোকানে ঠোঙা কুড়িয়ে খেত । পুরি মেঠাই খেয়ে জিভ বড় হয়ে গেল, আর কি ঘরে ফেরে ।

কম্পাউণ্ডার—তারপর ?

—শেষে ক'বছর পরে, খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে দামড়া হয়েছে যখন, তখন বিয়ের লোভে ঘরে এল একদিন । হাবার মা যখন এল তখন সে এইটুকু । ঐটুকু মেয়েই ধুচুনী বেচে ছোড়াকে খাইয়েছে, কত সেবা করেছে । আর হতভাগা……।

রাগে অভিমানে বুড়ীর গলার স্বর চেপে এল—হতভাগা দিনরাত ঠেঙিয়েছে বোকে । সন্দেহ করে লোহা তাতিয়ে ছেঁকা দিয়েছে । বউ শেষে ঘরের বার হওয়া বন্ধ করলো ।

বড় জমাদার—তার পরেই বুঝি ডাকাতি ধরলো ।

—না, লেঠেলি—মোহাস্তদের লেঠেল হলো গোপী ।

কম্পাউণ্ডারের চোখে হঠাৎ প্রবল একটা উৎসাহ কিলবিল করে

দণ্ডমুণ্ড

উঠলো।—হাঁ হাঁ মনে পড়েছে। সেই ফৌজদারী মামলা—সিমেন্টের খাদ নিয়ে মোহাস্ত আর চৌধুরীবাবুদের ফৌজদারী। এ পক্ষে দোসাদ লেঠেল ওপক্ষে জংলী মাঝি। বরাকরের দহে কত লাস গুম হলো। তিন বছর পরে মামলা। পাটনাই ব্যারিষ্টারের দল সওয়াল জেরায় গরম করে ছেড়ে দিল আদালত। দেড় শো সাফ্ফী, ন লক্ষ টাকা খরচ। কিন্তু আলবৎ মোহাস্তদের মোচ! মরদের মোচ বলতে হবে। টাকাব দরিয়া বইয়ে দিল—একটা লোককেও আইনে গাথতে পারলো না। লেঠেলদের ক'জনের ছুঁচার মাসের কয়েদ হলো শুধু।

—হাঁ, আমার গোপীর ৫ ছ'মাস হয়েছিল।

হাবিলদার—হুঁ বুঝলাম, তখন থেকেই গোপী তোমার হাত পাকিয়েছে।

বুড়ী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

ওয়ার্ডারেরা বললো—খামছিস কেন? বলে যা, পাপীস কাহিনী রামায়ণেও আছে, শুনতে দোষ কি?

—জেল থেকে ফিরে গোপী চাকরী নিল। তিলিদের কাঠের গোলায় করাত টানতো। ছুঁ'আনা করে পেতও রোজ। কিন্তু ছেলে-বেলায় সেই পেটকে দোষ, খাই খাই আর বদমেজাজ। আজ আচার নেই কেন, কাল তরকারী নেই কেন। মার খেয়ে খেয়ে হাড় মাটা হয়ে যেত বউয়ের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বুড়ী একবার হাবাকে খুঁজলো।—হাবা তখন হয়েছে। বউ গাঙ্গে গিয়ে ভিক্ষে খাটতে আরম্ভ করলো।

কম্পাউণ্ডার—ভিক্ষে কেন? আগে না কুলো ধুচুনী বেচতো!

—না, ধুচুনী আর বেচতো না। বুড়ী একটু আমতা আমতা করে বললো।

—একদিন ভিক্ষে থেকে সমস্ত রাত ঘরে না ফিরে বউ এল পরদিন

ফসিল

সকাল বেলা। গোপী টাঙি নিয়ে কাটতে গেল বৌকে। আমি বুড়ে। নাহুয, কতই বা গায়ের জোর। তবু গোপীর হাতে টাঙি ধরে ঝুলে রইলাম। বৌকে বললাম পালিয়ে যা, ঠেঁটা বৌ তবু পালালো না।

এখনও পৃথিবীর ঘুম ভাঙেনি। কার্তিকের ভরাট কুয়াশার আবছায়ায় ডাকাতের টাঙি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। গল্প জমে উঠেছে এইবার। এই তো রক্তাক্ত উপসংহাবের আরম্ভ। শ্রোতার দল রুদ্ধ নিশ্বাসে চুপ করে বসে শুনতে লাগলো।

—কিন্তু গোপীকে আটকাতে পারলাম না। আমারও চোখে পড়লো, বউ ধর্ম খারাপ করে এসেছে। চেহারা দেখেই সব বুঝে ফেললাম। মুচ্ছা গেলাম আমি।

বুড়ী ঢোক গিলে চোখ বন্ধ করে পানিকক্ষণ নিশ্বাস নিয়ে রইল। মুচ্ছার মতই মনে হলো।

হাবিলদার চোঁচিয়ে বললো—এই বুড়িয়া সাম্লে।

চোখ খুলে বুড়ী আরম্ভ করলো—জেগে উঠে দেখি, কাটামড়া বউয়েল বুকে চড়ে হাবা মাই খাচ্ছে। গোপী পালিয়েছে।

এতক্ষণে বুড়ীর শুকনো খটখটে চোখে জল দেখা দিল। চোখে আঁচল দিল বুড়ী।

—তারপর? এ প্রশ্ন আর এল না কারও মুখে। সকলের সব কৌতূহলের যেন ক্ষান্তি হয়ে গেছে।

হরি ডোম দেয়ালে ঠেস দিয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে—নাক ডাকছে ঘড় ঘড় করে। হাবিলদার অন্তরিক্তে তাকিয়ে থৈনির ভিবে বার করলো। ওয়ার্ডারেরা গম্ভীর মুখে বুড়ীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কম্পাউণ্ডার একটু বিমর্ষ, নিজের মনে কি ভাবছে।

দগুমুণ্ড

এই শুক্কতার মাঝখানে শুধু হাবাই লাফালাফি করছে কাকর নিয়ে। এই ক্লিন্ন ইতিহাসের কবল থেকে হাবাই যেন একটু ছিটকে সরে রয়েছে দূরে।

কম্পাউণ্ডার ভাবছে গোপীর টাণ্ডির কথা। কী নিদারুণ সে টাণ্ডি। মহারাজগঞ্জের জঙ্গলের গাড়োয়ানের আর হাবার মা'র গলায় পড়েছে তার কোপ। গোপী যেন তাব ভাগ্যকে কুপিয়ে বেড়িয়েছে, ক্ষাপা কার্ত্তিরিয়ার মত।

কস্বর আর সাজা! সাজা আর কস্বর! অন্তকালের দিকে তাকিয়ে, বিড় বিড় করে কথাগুলি মনের ভিতর আউড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কম্পাউণ্ডার।

অন্তকালের চোখের পাতা ঢুলে পড়েছে ভারি হয়ে। পরম রুদ্ধ অন্তকালের চেতরাই এ নয়। ধ্যানী শিবের মত স্থিরস্বন্দর। অপরাধী পৃথিবীর ঐ গলিত অন্ধকারের নিম্নোক বরষা খসে গেছে তার চোখে।... এখান থেকে এই সড়ক ধরে পুষ্পিত শাল মহারাজগঞ্জের জঙ্গল ছাড়িয়ে—গেরুয়া পলিপড়া দামোদর। স্বস্পিল চুটপালুর পাহাড়ী ঘাট—বাঁটার মেঘরঙা গিরিমালায় ভীড়। তারপর পুরুলিয়া রোড, ছপাশে বানক্ষেত, লাক্ষাচবা কুলের জঙ্গল—ঝালদা। সহ্যে স্নিগ্ধ, বহুণায় উজ্জ্বল, আলোয় আলোকিত, স্থচির শ্রাম পৃথিবী।

খাটিয়ার দিকে তাকালো অন্তকাল।—না নরী কুমীর নয়। লাড়াইয়ে খায়ল জবরদস্ত এক সেপায়ের লাস, সাদা ককনে ঢাকা। জঙ্গ বাহাদুর গোপী। নাই বা বাজলো বিউগল, নাই বা বাজলো ড্রাম। কোন বিলাপ গাইতে হবে না ব্যাগপাইপে। কাতার বেঁধে সেপাইরা বিদায় দেবে না গোপীকে। রাইফেল তুলে আকাশে শোকে'র শট দাগবার দরকার নেই। কোন আওয়াজ হবে না গোপীর ফিউনারেলে।

ঐ বড় ঝিলের উত্তরে। মোনালী রোদের ছিটে লেগেছে এখন

ফসিল

ফণীমোরঝার বনে । সেইখানে এক জায়গায়, অজস্র শান্ত মাটির ধূলে দিয়ে চাপা দিতে হবে গোপীকে ।

খাটিয়ার পায়াতে ঠোকর দিয়ে দাঁড়ালেন জেলার বাবু ।

—ডিসপার্স । বেকুব সব । লাস হটাও এফুনি । ডোম বোলাও ।

রূপ করে রাইফেলটা নামিয়ে রাখলো অল্পকূল । এগিয়ে এসে খাটিয়ার একটা ধার তুলে ধরে বুড়ীকে বললো—উঠাও !

বুড়ী কঁাদ কঁাদ হয়ে বললো—সে কি বাবা, আমি একা কি করে পারি । তার চেয়ে বরং যা খুশী ।.....

—ওঠাও । অল্পকূল যেন ধমক দিল ।

—এ কি ? এ কি ? সকলে একসঙ্গে সবিস্ময়ে চোঁচিয়ে উঠল ।

হাবিলদার—এ অল্পকূল, পাগল হ'লে নাকি ?

কম্পাউণ্ডার—আরে গোসাই, চাকরীর ভয় নেই ? তোমার ডিউটি শেষ হয়নি এখনও ।

বড় জমাদার—এ অল্পকূল, উদ্যৈ ছেড়ে নাও, এ কি করছো তুমি ?

ততক্ষণে গোপীর খাটিয়ার এক দিকটা তুলে অল্পকূল তার ঘাডের পেছনে চড়িয়ে ফেলেছে । অপর দিকটা বুড়ীর মাথার ওপর । লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে, ফটক ছেড়ে বিশ গজ চলে গেছে তারা ।

পাকুড় গাছটা পার হয়ে বড় সড়কের ওপর এসে ওরা উঠলো । হাবা সমান তালে পা ফেলতে পারছে না, পেছনে দৌড়ে দৌড়ে চলেছে । ঝিলের দিকে মোড় ফিরতে পথের একটা ঘুমন্ত খেঁকি কুকুর জেগে উঠে উৎসাহে লেজ নেড়ে ওদের সঙ্গ নিল ।

অল্পকূলের রাইফেলটা তুলে নিয়ে হাবিলদার কম্পাউণ্ডারকে ফিস ফিস করে বললো—ডিসমিস !

কম্পাউণ্ডার—তবুও ভাল, জেল যেন না হয় ।

গ্লানিহর

হিরোতা মারু পোতাশ্রয় ছেড়ে অনেক দূরে এগিয়ে এসে এবার ডাইনে মোড় নিল। ধীরে মিলিয়ে গেল এপোলা বন্দরের অভ্রলহী টাওয়ার আর ঠাসাঠাসি নোডর করা কার্গোবোটের মাস্তুলের ভীড়। নিস্তরঙ্গ আরব সমুদ্রের বুক চিরে হিরোতা মারু চলল ক্ষুদ্র সিঙ্কুঘোটকে মত সাঁতার দিয়ে—তার সধু প্রথাসবায়ু মেঘের মত উড়ে গিয়ে এলিফান্টা পাহাড়ের ছোট চুড়োটাকে ঘিরে ধরল। বোম্বায়ের মাথার ওপর তার ঘনমসী কালো ধোঁয়ার স্বগোল মারাঠা টুপিটা শুধু স্তম্ভির হয়ে লেগে রইল উত্তরের আকাশে।

ঠিক এমনি সময়ে হাঁ করে এই আকাশ ভুবনের খেলা দেখাটা যে কত বড় মৃত্যু, তা টের পেলাম ডেকের উপর দৃষ্টি পড়তে। শোণপুরের মেলার একটা ভগ্নাংশ যেন—এত ভীড়। এরি মধ্যে বিছানা বিছিয়ে যে যার জায়গা কায়েমী করে নিয়েছে। বাস্ক তোরঙ্গ বদনা ছড়িয়ে চৌহদ্দি রেখেছে পাকা করে। স্থান নেই। কিন্তু স্থান চাই, শুভে হবে। এডেন পৌছতে পুরো ছটি দিন, ঠায় দাঁড়িয়ে তো আব যাওয়া যায় না।

কাথিয়াবাড়ী বেনেরা তাদের ছেঁড়া জুতোগুলো পর্যন্ত দুহাত অস্তর এলোপাথাড়ি করে সাজিয়ে রেখেছে—যতদূর পারে দগলের পরিদি রেখেছে ফলিয়ে। মুক্তিমান স্বার্থোন্মাদ সব, ক্ষুরের মত শান দেওয়া সওদাগরী বুদ্ধি, শত অনুরোধেও কোন ফল হবে না।

জাজীবর বোরারা চলেছে। লবঙ্গ বেচা টাকায় লাল লাল চেহার। প্রত্যেকের হুটী করে বিছানা, একটা শোবার আর একটি নেমাজ পড়বার। সামনে দাঁড়িয়ে মুর্ছা গেলেও এরা আধ হাত যাঁয়গা ছেড়ে

ফসিল

দেবে না। আমারি মত নিরুপায় এক পালেস্তিনী ইহুদী সাহেব অগত্য তার স্ট্রাকেশটার ওপরেই বিছানা পেতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল কিন্তু আমি কি করি।

নজরে পড়ল ডেকের শেষপ্রান্তে খাচার মত মুখোমুখি দুটো বেশ স্পারিসর কাঠের ঘর, ওপরে নোটিশ লেখা—For horses only ; শুধু ঘোড়ারা থাকিবে। এখন কিন্তু ঘোড়ারা নেই, ফিরতি পথে রেসের খোড়া যাবে। বাক্স বিছানা সমেত একটা খাচার ঢুকে পড়লাম। দূরে দাড়িয়ে জাহাজের কোরিয়ান মেথরটা আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। এগিয়ে এসে আপত্তি করতেই একটা সিগারেট উপহার দিলাম। খুসী হয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় খাচাটার দিকে লক্ষ্য পড়তেই বিস্মিত হতে হ'ল। সপরিবারে এক বাঙালী ভদ্রলোক সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর দুটি ছোট ছোট ছেলে—একটি বছর পাচেক আর একটি দুইপোয়, মাত্র হামা দেবার বয়সে পৌঁছেছে। খুসী হলাম দেখে। বাঙালী সহযাত্রী, তবে মনের স্বখে বাঙলা বলা যাবে—দিন যাবে ভাল ভাল। তা ছাড়া একজোড়া বাঙালী খোকা, জাহাজী জীবনে কচিং এমন বোল আনা স্বদেশী সঙ্গ মেলে।

কিন্তু বড় নিরাশ হতে হ'ল। অবাক হলাম ভদ্রলোকের সৌজন্য-বোধের অভাব দেখে। এঁদের দিকে এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক চকিতে একবার দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। ভদ্রমহিলা ঘোমটা টেনে কাঠের সিন্দুকটার আড়ালে গিয়ে বসলেন। সাগ্রহ আলাপনের উৎসাহটা উত্তোকেই ক্ষান্ত হয়ে গেল। নিজের খাঁচায় ফিরে এলাম ক্ষুণ্ণ হয়ে।

শুয়ে শুয়ে দেখছি মহিলাটি ষ্টোভ জ্বলে থিচুড়ী রাঁধলেন। ভদ্রলোক

গ্রানিহর

আর বড় ছেলেটা খেয়ে নিল। শিশি থেকে গুঁড়ো দুধ বার করে নিয়ে জ্বাল দিলেন—ছোট ছেলেটাকে খাওয়ান হ'ল। ভদ্রলোক সিগারেট মুখে দিয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগলেন। মহিলাটিও খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে তোরঙ্গ থেকে কাঁথা বার করে সেলাইয়ের কাজে মন দিলেন।

বিকেলের দিকে জাহাজের দোলা বেড়ে ওঠায় ঘুম গেল ভেঙে। চোখ বুঁজেই শুনিছি মাথার কাছে কুর কুর একটা শব্দ। চেয়ে দেখি বড় ছেলেটা আমারি মাথার কাছে বিছানার কোণে বসে এক বাটি গরম কফি নিয়ে খাচ্ছে আব মাঝে মাঝে মিছরি চিবোচ্ছে সশব্দে। ছোট ছেলেটাও মেঝের ওপর বসে একটা খালি সিগারেটের কৌটো নিয়ে দুহাত দিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ছে। বড় ছেলেটাকে প্রশ্ন করলাম—কি খোকা, নাম কি তোমার ?

—পটল।

—ও তোমার কে হন ?

—আমার ভাই পন্টু।

—আর গুঁরা কারা ? বাবা আর মা ?

—হাঁ।

—কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?

—আমরা যাচ্ছি কেপ।

—তোমার বাবা বুঝি সেখানে চাকরী করেন ?

—হাঁ।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল পটল। এবার তার পালা।

প্রশ্ন করল—তুমি কে ?

—আমিও চাকরি করি। যাচ্ছি এডেন।

ফসিল

—তোমাকে কে রান্না করে দেয় ?

—আমি হোটেল থেকে খাবার কিনে খাই ।

—তবে তোমাকে হাওয়া করে কে ? যখন কাশি হয় ?

পটলের প্রশ্নে কৌতুক আর কৌতূহল জাগিয়ে তুলল । জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার বাবার বুঝি খুব কাশি হয় ?

—হ্যাঁ, হাঁপানি কাশি । কাউকে বলবেন না কিন্তু ।

—কেন বল ত ?...পটলের কথাবার্তা ধাঁধার মত ঠেকছে ।

—জাহাজের ডাক্তার আমাদের নামিয়ে দেবে তা হ'লে ।.....পটল উত্তর দিল ।

এইবার বুঝলাম । ছেলেটির বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশ পরিষ্কার । দেখলাম আলাপের সঙ্গী হিসেবে পটল নেহাৎ নগণ্য নয় । এ বিষয়ে বাপের চেয়েও বেশী শালীনতার পরিচয় দিয়েছে সে ।

প্রশ্ন করলাম—তোমার বাবার নাম কি ?

—বিকাশচন্দ্র গাঙ্গুলী ।

—তোমাদের বাড়ী কোথায় পটলবাবু ?

—কিষ্কারি ।

—আর মামাবাড়ী ?

পটল খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল—ইণ্ডিয়া । আমার প্রশ্ন-প্রবাহে বাধা পড়ল । এ সব আবার কি বলে ! বাড়ী কিষ্কারি, মামাবাড়ী ইণ্ডিয়া ? মনে মনে বিচার করে দেখলাম—তাই হবে বোধ হয় । বেচারী গাঙ্গুলী হয়ত বহুদিন দেশ ছাড়া । পেটের দায়ে পড়েছে গিয়ে সুদূর কিষ্কারি ।

এবার নজর পড়ল ছোট্টটার ওপর । ডাকলাম—পন্টু । ছেলেটা দ্রুত হামা দিয়ে চলে এল । পটল চোঁচিয়ে উঠল—বিছানায় বসাবেন

মানিহর

না, মূতে দেবে। এই বলে সে পন্টুকে সবলে দুহাত দিয়ে ধরে বৃকের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে বেতালা পা ফেলে চলে গেল।

পটলের মা যে আধুনিক। নন তা বুঝতে দেরী হয় না। মাথার ঐ ঘোমটাটিই তার প্রমাণ। তবে তিনি সাহসিকা নিশ্চয়ই। ছুটি শিশু সন্তান নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দূর কিম্বালিতে গিয়ে স্থখে ঘর করছেন—বাঙলার ছায়া স্থনিবিড় পল্লীর এক টুকরো সংসার ক্লম্ব মহাদেশের কোলে এক মরু উপত্যকায় ছিটকে গিয়ে পড়েছে।

খাওয়া শোয়ার সময়টুকু ছাড়া পটল আর পন্টু সব সময় আমারই আশে পাশে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। পন্টু, এক একবার ক্লান্ত হয়ে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে—বিছানায় তুলে নিই। পটল তার মায়ের ইসারা পেয়ে কখনও কখনও চলে যায়—ডেকের দোকান থেকে সোড়া দেশলাই সিগারেট কিনে আনে। তুপুরে যখন মহিলাটি গাঙ্গুলী মশাইয়ের সঙ্গে স্নানাগারের দিকে যান, পটল তখন বসে বসে জিনিষপত্র পাহারা দেয়, পন্টুর ওপর চোখ রাখে।

দিন কাটছিল। আর কটাই বা দিন? গাঙ্গুলীর অসামাজিকতায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম সত্যি কিন্তু পটল আর পন্টু সে ক্রটি ভালভাবেই মিটিয়ে দিচ্ছে। দিবারাত্র সমুদ্রের একটানা কলোচ্ছ্বাস; কাণ ও মন দুই বদীর হয়ে যায়। পন্টু ও পটল আচমকা এসে মিঠে কলরব জাগিয়ে তোলে। একটু স্বজনতা পাই, তাতেই মন ভরে ওঠে!

পটল ছেলেটা বড় কাজের। গিচুড়ী রান্না থেকে বিছানা করা পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজে সে তার মাকে সাহায্য করে। ভাবছি এত বুদ্ধিমান ছেলেটা, লেখাপড়া শিখছে তো? নইলে হয়তো কপালে কুলিগিরি আছে। যে সাংঘাতিক দেশে থাকে! পটল এসে ডাকল—

ফসিল

মিষ্টার, কি করছ ? জিজ্ঞাসা করলাম—পটলবাবু, তুমি লেখাপড়া কর না ?

—হাঁ, আমি আর মা পড়ি !

—কে পড়ায় ?

—বাবা । পন্টু ও পড়বে আর একটু বড় হ'লে ।

চুপ করে এদের কথা ভাবছি । গাঙ্গুলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি । পটলের সঙ্গে এমনি ধরণের খণ্ড আলাপের ভেতর দিয়ে তাদের পরিচয়টা ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ।

পটল বলল—জান মিষ্টার, আমি বিলাত যাব পড়তে । বাবা বলেছে । বললাম, তাই নাকি ? বেশ বেশ, নিশ্চয়ই যেও, পটলবাবু ।

পটল আবার বলল—আমার বিয়ে হবে মেমের সঙ্গে, মা বলেছে । লজ্জিত হয়ে পটল বালিশে মুখ গুঁজে রইল ।

আদর করে পটলের মাথাটা ঝেঁকে দিয়ে বললাম—বিয়ের সমন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলো না যেন । পটল একটু সিরিয়াস হয়ে সাগ্রহে বলল—তবে তোমার নাম লিখে দিয়ে যাও । চিঠি দেব ।

নাম লিখে দিতে হ'ল ।

গাঙ্গুলী তার নিত্যকার নিয়ম মত বৈকালীন ভ্রমণের জন্ত ওপরের ডেকে উঠে গেলেন । আমিও উঠব উঠব করছি । মহিলাটা বালতিতে থিচুড়ীর চাল ধুচ্ছেন—মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে ।

দেখছি । স্থির দৃষ্টি নিয়ে দেখছি ঐ মহিলাটাকে । মহিলা ? মিসেস গাঙ্গুলী ? পটলের মা ?

চোখ ছটোকে লোহার শিক দিয়ে কে যেন নির্মমভাবে খুঁচিয়ে দিল । এ তো মহিলা টহিলা নয় ! এ যে আমাদের ভৈরব মালীর মেয়ে মালতী ।

গ্লানিহর

এই মালতী, যে জেঠামশায়ের বাড়ীর ঝি ছিল! কথাবাত্তা নেই হঠাৎ জেঠিমার গয়না চুরি করে পালাল, শিশির বেয়াবার সঙ্গে। দশা পড়ে জেলে গেল। ফিরে এসে ঘর নিল কাশীর এক কুখ্যাত পাডায়। তার প্রণয়াম্পদ শিশির বেয়ারা তারই হাতে খুন হ'ল একদিন। তারপর থেকে সে ফেরার। পুলিশ এতদিন খোঁজাখুঁজি করেও হদিস পায়নি।... নব জানি। আমি ওর সাক্ষাৎ চিত্রগুপ্ত। ওর পাপ জীবনের সমস্ত তালিকা আমার কাছে গচ্ছিত।

এখন বুঝেছি ঐ আধ হাত ঘোমটার অর্থ। ছি ছি, একেই এতদিন মনে মনে এত স্তুতি করে এসেছি। ঘটনার পাকে এত বড় বান্দ্র নুকিয়েছিল প্রহেলিকার মত!

গয়নার শোকে জেঠিমার বুকফাটা চীংকার যেন শুনতে পাচ্ছি। ডাকব পুলিশ। আমি শুধু ওর চিত্রগুপ্ত নই, আমি এবার ওর গম।

...সোজা জিজ্ঞেস করব—ভাল চাস তো মাগি জেঠিমার গয়নাগুলো কিরিয়ে দে। তা হ'লে ছেড়ে দেব, নইলে রেহাই নেই।

...আরো জানবার আছে। সুস্পষ্ট উত্তর চাই—শিশিবকে খুন করল কেন? গাঙ্গুলীর সঙ্গে কতদিন আছে?

...না হয় একবার সামনে আসুক! ক্ষমা চা'ক, অকপটভাবে স্বীকার করুক অপরাধ। তারপর বিচার করা যাবে ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা।

...কানটা ধরে একবার জিজ্ঞেস করলে হয়—এখনো পিরিতের ব্যবসা ছাড়তে পারলি না? গাঙ্গুলির কাঁচা মাথাটা না খেলে আর চলছিল না? কেন? সন্ন্যাসিনী হতে পারিসনি—বৃন্দাবন-টন গিয়ে?

অনেক কিছুই বলবার ছিল কিন্তু বলা আর হ'ল না আজ। একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচে মনের সমস্ত উদ্ধত বাচালতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু বলতেই হবে।

ফসিল

কিংকর্তব্য গুলিয়ে গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখলাম পল্টু তার অর্ধভুক্ত বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে বসে বসে আমার বিছানাটাকে নোংরা করছে। টেনে নামিয়ে দিলাম—যা এখান থেকে এক্ষুনি চলে যা।

পটল ছবির বই দেখছিল। বললাম—এই ছোড়া, ভাগ হিঁয়াসে : আর আসিস না।

পটল আর পল্টু চলে গেল।

...গাঙ্গুলীকে ডেকে একবার সাবধান করে দেব। ওর ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠছি। না হয় রক্ষিতাই রেখেছে কিন্তু ইডিয়টটা কি আর কাউকে পায়নি? এমন একটা বিষকন্ডাকে করেছে সহচরী। ওর একটা ছোবলে যে গরল উগরে আসবে, তাতে কয়টি মুহূর্ত টিকে থাকবে এই সংসারবিলাস।

...শিশির বেয়ারা ঘটিত কাহিনীটা শুনিয়ে দেব, তাতেও যদি মৃত লোকটার হুঁস হয়। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, ওকে বলেও কোন সফল হবে কি? এই গাঙ্গুলীই হয়তো একটা রসাতলচারী নররূপী সরীসৃপ। জেনে শুনেই কালনাগিনীর সঙ্গে এক বিবরে বাসা বেঁধেছে।

...নাঃ, কিছু একটা করতে হবে। এই পুংশলী নারীটার এত নিখুঁত পাতিব্রতের অভিনয় আর সহ হয় না।

পটল আর পল্টু এদিকে আর আসে না। নিশ্চিত হলাম। আর যেন না আসে। এখন কি করা কর্তব্য সেইটাই ভাবি।

...যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। দুজনকেই ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে স্মৃতি: বলব—আর যেন ভবিষ্যতে কোন কেলেকারী না করে। যেন দুজনে মিলে মিশে ভালভাবে থাকে। আর ছেলে দুটোকে যেন আর্থ্যসমাজে: অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেয় যাতে ভবিষ্যতে মানুষ হতে পারে।

গ্লানিহর

মাথার কাছে থস থস একটা শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখি পটল এসে দাড়িয়েছে। অগ্নিদিনের মত বিছানা ঘেসে নয়—একটু দূরে। তাকাতেই বলল—মিষ্টান, তুমি আমাদের মারবে কেন ?

—কে বলেছে আমি তোদের মারব ?

—হাঁ, মা বলেছে তোমার কাছে গেলে তুমি মারবে। বড পাকা পাকা শোনাল ছেলেটার কথা। বললাম।—যা নিজের যায়গায় যা, চট্ চট্ করিস না এখানে।

পটল পণ্টু নিজেদেরই বিছানায় বসে সারাদিন গেলে, আবোল তাবোল বকে, পায় আর ঘুমোয়। মালতীর মাথায় এষ্ট কদিন আর ঘোমটার বলাই নেই। এ দৃশ্য দেখি, চক্ষু পোড়ে, অন্তদাহও হয়।

...আজই তলব করব ছুজনকে। শেষ সাবধান বাণী শুনিয়ে, প্রতিজ্ঞা করিয়ে, ছেড়ে দেব।

পটল অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে বলল—মিষ্টান, তোমার দেশলাইটা দাও তো। ষ্টোভ জ্বালতে হবে, শিগগির দাও। পটলের মুখ শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। প্রশ্ন করলাম—কেন পটল কি হয়েছে ? এত ইপাচ্ছ কেন ?

—তেল কপূর গরম করব। বাবার ইপানি ধরেছে, বুক ব্যথা করছে।

দেখলাম গাঙ্গুলী বশায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করছেন। মাঁ মাঁ করে ইপাচ্ছেন বুক হাত রেখে। মালতী এক হাতে তাঁর বুক হাত বুলোচ্ছে অপর হাতে করছে পাখার বাতাস।

পটল ষ্টোভ ধরিয়ে একটা বাটিতে তেল কপূর চড়িয়ে দিল।

ওদিকে আমার কিছু করার নেই। ভাজা কপূরের স্বগন্ধ ভেসে

ফসিল

আসছে। পন্টু সবেগে হানা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। এর সঙ্গে ও আজ আমার কোন কাজ নেই।

ইপানির জোর বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ। এবার সাঁ সাঁ শব্দ ছেড়ে দস্তুর মত আর্ন্তনাদ শুরু হ'ল। মালতী গাঙ্গুলীর পায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। জল আর আকাশের নীলঘন রূপ ফিকে হয়ে এসেছে। এডেন বোধ হয় আর বেশীদূর নয়।

শেষ কথাটা শুনিয়ে দিয়ে নেমে পড়তে হবে। কিন্তু কখন বলি ?

পটল আন্তে আন্তে এসে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল—ডাক্তারকে বলে দিও না, মিষ্টার। আমাদের নামিয়ে দিলে খুব কষ্ট হবে, বুঝলে ?

কর্তব্য আর স্থির হ'ল না। একটা অলক্ষ্য ভীকৃত্য এসে শেষ কথাটাকেও একেবারে চাপা দিয়ে দিল—বলা আর হ'ল না।

ভাবছি পটল ও পন্টু। বড় হবে, বিলেতে যাবে। মেম বিয়ে করবে। এদের জীবনশোণিত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে মহামানবের সহস্র শ্রোতে।

ভাবছি—মালতী আর গাঙ্গুলী। কোথায় তারা ? আদিম নীহারিকার মত সব অন্ধকারের বোঝা নিয়ে তারা মুছে গেছে অনেক দিন। আজ বাদের দেখছি তারা আর কেউ নয়।—তারা শুধু পটলের মা আর পটলের বাবা।

চিন্তার আবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা সুখতন্দ্ৰা ধীরে নেমে আসছিল কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠতে হ'ল—শিশুর আক্রমণে। পন্টু তার দস্তহীন মাড়ি দিয়ে কামড়ে ধরেছে আমার নাক ; তার মুখের লালায় আমার সমস্ত মুখ প্রলিপ্ত করে তুলেছে।

গ্রানিহর

তুলতুলে কচি মানুষের মুখ, জেলির মত নরম ঠোঁট। নতুন মানুষের
গন্ধ পাচ্ছি পন্টুর দুধে মুখে। পন্টুকে বৃকের ওপর তুলে নিলাম।

এডেনের গ্যারিসন আর কয়লার স্তূপ দেখা যাচ্ছে। যাত্রীদের
কোলাহল শুনছি—এডেন এডেন। এডেন এসে পড়েছে।

মনে পড়ল আমাকেও নামতে হবে, কিন্তু পন্টু তখন অঘোরে
ঘুমোচ্ছে আমার বৃকের ওপর—স্বপ্নস্বপ্ন মানুষের ভবিষ্যৎ কুণ্ডলী পাকিয়ে
পড়ে রয়েছে।

পন্টুর ঘুম ভাঙতে হবে। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

সুন্দরম্

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য্য সমাধা করে দেওয়া; নাচঘের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো!

কিন্তু বাধা আছে—সুকুমারের ব্রহ্মচর্য্য। বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ ফোঁটা তিলক করেছে সে। আজও পায়ে সেধে তাকে মুস্তুরির ডাল খাওয়ান যায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে শুধু ক'খানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা। বাগানের পুকুরঘাটে নির্জন তপস্বী রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার স্বপ্ন। প্রতি কুন্তকে রেচকে সুকুমার অন্তর্ভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তডিং স্পর্শ—শ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতে।

সুকুমার চোখ বুঁজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভৃত কন্দবে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে—মুক্তি দে, মুক্তি দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেগা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে—বাস্ এই এগজামিনটা পয্যন্ত। তারপর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার।

সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার বলতেন—প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভাল জিনিষ পড়ুক, গায়ে নাংস লাগুক—এসব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম!

সুন্দরম্

কিন্তু মা, পিসিমা, ছোট বোন রাহু আর ঝি—তাদের মন প্রবোধ
নানে না।

সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাস ডাক্তারকে—যত শীগগির পান
পাত্রী ঠিক করে ফেল। আর দেবী নয়! ঝয়ের কৌদল তো লেগেই
আছে—ছি ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস। ছোটজাতের
ছোটঘরেরও এমন কসাইপনা করে না বাপু।

সমস্তা সমাধানের ব্যবস্থা হলো। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন।
ভগ্নীপতি কানাইবাবু স্বকুমারের মতিগতির চার্জ নিলেন। যেমন কবে
পারেন কানাইবাবু স্বকুমারকে সংসারমুখো কববেন।

পাশের খবর বেরিয়েছে। কানাইবাবু স্বকুমারকে দিয়ে জোর করে
ব্রথাস্তে সই করালেন।—নাও সই কর। মুন্সেফী চাকরী ঠাট্টার নয়!
সংসারে থেকেও সাদনা হয়। ঐ যাকে বলে, পাকাল মাতের মত
থাকবে। জনকরাজা যেমন ছিলেন।

বাড়ীর বিষয় আবহাওয়া ক্রমে উৎফুল্ল হয়ে আসছে। কৈলাসবাবু
পাত্রী দেখে এসেছেন। এখন সমস্তা স্বকুমারকে কোন মতে পাত্রী
দেখাতে নিয়ে যাওয়া। কানাইবাবু সকলকে আশ্বস্ত করলেন—কিছু
ভাববার নেই; সব হো যায়গা।

সংসারের ওপর স্বকুমারের এই নির্লেপ, এখনও কেটে যায় নি
ঠিকই! তবু একটু চাঞ্চল্য, আচারে, আচরণে রক্তমাংসের মানুষের
মেজাজ একআধটুকু দেখা দিয়েছে যেন।

তবু একদিন পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সঙ্গে স্বকুমারের একটা বচসা
শোনা গেল। বাড়ীর সবারই বুক ছুরছুর করে উঠলো। ব্যাপার কি?

কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে স্বকুমারকে উপগ্রাস পড়তে হয়েছে।

ফসিল

জীবনে এই প্রথম। নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে ঘরে বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছে তাকে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হয় বলা তো যায় না।

কিন্তু উপগ্রাস না নরক। যতসব নীচ রিপুসেবার বর্ণনা। সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, এখনও গা ঘিন ঘিন করছে।

স্বকুমার বললো—আপনাকে এবার ওয়ানিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম, কানাইবাবু।

মানে অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন—আজ সন্ধ্যায় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞাচক্রে দিব্য। তা ছাড়া ভাল ছবি—ধ্রুবের তপস্যা। মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবে।

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেন্ট বোধ হয় সাংখ্যক হয়ে উঠলো। স্বকুমার কাব্য পড়ে, কবির আখডায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন ঘন সিনেমায় যায়। এদিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পত্রও চলে এসেছে।

কিন্তু অনাসক্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। আজকাল স্বকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবু ফুলের স্বগন্ধে মনটা অকারণেই উড়ে চলে যায়—ধূলিধূসর সংসারের বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমায় সাঁতার দিয়ে বেড়ায়! একটা বিমল স্বথকর বেদনা। কিসের অভাব! কাকে যেন চাই! কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় স্বকুমার।

রাত করে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরবার পথে কানাইবাবু স্বকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—নাচটা কেমন লাগলো?

স্বকুমার সহসা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললো—কানাইবাবু!

সুন্দরম্

—কি ?

—মাগুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।

—নিশ্চয় । কালই চল বারাসত । যাদব বোসের মেয়ে বনলতা ।

তোমার মেজদি যেতে লিখেছে আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেন ।

উকীলের মুহুরী যাদব বোস । বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালই । যাদব বোস অল্পপণে সংপাত্র খুঁজছেন ।

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেন ।—ভাল করে দেখে নে স্কু । মনে যেন শেষে কোন খুঁত খুঁত না থাকে ।

যাত্রাদলের রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে বতদর সম্ভব ভবরঙ্গ করে শাজানো হয়েছে ! বিরাট একটা ঝকঝকে বেনারসী সাড়ী আর পুরু সাটিনের জ্যাকেট । পাড়ার মেয়েদের কাছে দারকরা চুড়ি, ঝলি, বালি ও অনন্ত কল্লুই পর্য্যন্ত বোঝাই করা ছুটি হাত । ঘানে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গলার ওপর । মেয়েটি দম বন্ধ করে, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়ালো ।

বনলতার শক্ত খোপাটা চট করে খুলে, চুলের গোছা ঢহাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন—দেখে নে স্কু । গাঁয়ের মেয়ে হ'লে হবে কি ? তেলচিটে ঘাড় নয়, যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেপেছি । রামোঃ ।

মেজদি যেন কিজিয়লজি পড়াচ্ছেন । বনলতার খুঁতনিটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন । চোখ মেলে তাকাতে বললেন—
টারি কানা নয় । পায়চারী করালেন—খোঁড়া নয় । স্কুমারের

ফসিল

মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন—দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নেই !

দেখার পালা শেষ হ'লো। বাড়ী ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি তে যোগীবর, পছন্দ তো ?

সুকুমার চুপ করে রইল। মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়। কানাইবাবু বুঝলেন, এক্ষেত্রে মৌনঃ অসম্মতি লক্ষণঃ।

—সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া, এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয়!—কানাইবাবু মনের বিরক্তি মনে চেপে রাখলেন।

পিসিমা বললেন—ছেলের আপত্তি তো হবেই। হাঘরের মেয়ে এনে হবে কি ? মুহুরী টুহুরী সঙ্গ কুটুঙ্গিতে চলবে না।

সুন্দরী মেয়ে চাই। এইটেই বড় বাধা দাঁড়িয়েছে এখন। কৈলাস ডাক্তার পাত্ৰী দেখছেন আর বিপদের কথা এই যে, তাঁর চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়। তাই কৈলাস ডাক্তার কাউকে সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর রুচি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথম ছেলে, জীবনসঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে যাকে, তাঁরই মতটা গ্রাহ্য। তারপর আর সকলের।

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুংসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্তার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালো। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাস ডাক্তারকে মর্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে এ দৌর্ভাগ্য তাঁর আর নেই।

বাংলোর বারান্দায় সোফায় বসে নিবিষ্ট মনে কৈলাস ডাক্তার এই কথাই ভাবছিলেন। এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝাঙ্ক সার্জিন ময়না ঘরে মাহুঘের বুক চিরে দেখে এসেছে,

সুন্দরম্

তাকে আর বোঝাতে হবে না—কা'কে সোনার দেহ বলে। মানুষের গম্ভীর রূপ—এর পরিচয় কৈলাস ডাক্তারের মত আর কে জানে! কিন্তু তাই এই ভিন্ জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কে? দুঃখ এইটুকু।

ইঠাং শেকল-বাঁধা হাউণ্ডটার বিকট চাঁৎকার আর লাফঝাঁপ! ফটক মলে হুডমুড করে ঢুকলো মানুষের বাঙ্গমূর্তি কয়েকটি প্রাণী। যদ্ ডোম আর নিতাই সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে।

যদ্ ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুং করে এসলো একটা ভিখারী পরিবার। নোংরা চটের পোটলা, ছেঁড়া মাদুর, উত্তন, হাড়ি, ক্যানিস্টারা, পিঁপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদম্ব জগতের অংশ। সোরগোল শুনে বাড়ীর সবাই এল বেরিয়ে।

কৈলাসবাবু বললেন—কে রে এরা যদ্? চাইছে কি?

—এ ব্যাটার নাম হাব বোষ্টম, তাঁতীদের ছেলে। কৃষ্ণ হয়ে ভিক্ষে করেছে।

কৃষ্ণ হাবু তার পটিবাঁধা হাত দুটো তুলে বললো—কপা কর বাবা!

—এই বুড়ীটা কে?

—এ মাগীর নাম হামিদা। জাতে ইরানী বেদিয়া—বসন্তে কানা হবার পর দল ছাড়া হয়েছে। ও এখন হাবুরই বো।

হামিদা কোলের ভেতর থেকে নেকড়ায় জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললো—বাস্কা কা জান হজুর! এক পিয়ালী দুধ হজুর! এক মুঠি দানা হজুর!

—আর এই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা কে? পিসিমা প্রশ্ন করলেন।

—ওর নাম তুলসী। হাবু আর হামিদার মেয়ে।

—আপন মেয়ে?

ফসিল

—হাঁ পিসিমা। যদ্ উত্তর দিল।

তুলসী একটা কলাই করা খালা হাতে বসে আছে চুপ করে। পরিধানে পাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরে দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে হাতে একটা কৌড়ির তাবিজ।

দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তৎ সর্বাঙ্গে একটা রুট পরিপুষ্ট। কোন ডাকিনীর টেরাকোটা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার খুলিটা বেটপ টেরে বেকে গেছে। চোয়াল জুড়ে জন্তুর একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যায়, গা শির শির করে। কিন্তু যদ্ বললো—তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভর।

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসেনি। মিউনিসিপ্যালিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে। নতুন আফিমের গুদাম হবে সেখানে। সহরের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নেই।

হাবু কান্নাকাটি করলো—একটা সার্টিফিকেট দিন বাবা। মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পেছনে থাকবো। দীননাথের দিবিয়া, হাটবাজারে ঘেসবো না কখনো। তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো আর রোগ বালাই নেই।

পিসিমা বললেন—যেতে বল, যেতে বল। গা ঘিন ঘিন করে। কিছু দিয়ে বিদেয় করে দে রাগু।

রাগু বললো—আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাউজটা দিয়ে দিই। এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবে।

—হাঁ দিয়ে দে। থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়ীও দিয়ে দে। বয়স হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তো।

সুন্দরম্

কৈলাস ডাক্তার বললেন—আচ্ছা যা তোরা। মাটিফিকেট দেব, কিন্তু গবরদার হাটবাজারে আসিস না।

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলে তুলসীর কথাটাই আলোচনা হলো আর একবার। কৈলাসবাবু হেসে হেসে বললেন—দেপলে তো সুন্দরী তুলসীকে। ওরও বিয়ে হয়ে যাবে জানো?

ঝি উত্তর দিল—বিয়ে হবে না কেন? সবই হবে। তবে সেটা আর বিয়ে নয়।

কৈলাসবাবু আর একটি পাত্রী দেখে এসেছেন। নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়া। মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুক।

দেখান হ'ল দেবপ্রিয়াকে। মেদের প্রাচুর্যে বয়স ঠিক ঠাঠর হয় না। চওড়া কপাল, ছোট চিবুক, গোল গোল চোখ। গায়ের রং মেটে কিন্তু সুমঙ্গল। ভারি ভুরু দুটোতে যেন তিব্বতী উপত্যকার ধূস্ত একটু ছায়া—প্রচ্ছন্ন এক মঙ্গোলিনীকে ইমারায় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। সে বোধ হয় জানে, তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতই। দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভাল।

সুকুমার ই না কিছুই বলে না। বলা তার স্বভাব নয়। বোঝা গেল এ মেয়ে তার পছন্দ নয়।

পিসিমাও বললেন—হবেই না তো পছন্দ। শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় না।

তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটো।

কৈলাস ডাক্তার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সমস্তা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। এ মোটেই সহজ সরল ব্যাপার নয়। নানা নতুন উৎসর্গ দেখা দিচ্ছে

ফসিল

একে একে । শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না । বংশ, বিত্ত, শিক্ষা ও রূপ দেখতে হবে ।

মাঝে পড়ে পুরাত ভটচাখি আরও খানিকটা ইক্ষন জুগিয়ে গেছেন সমস্তাটা ক্রমেই তেতে উঠেছে । ভটচাখি বাড়ীর সকলকে বুঝিয়ে গেছেন—নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিষটা । কুলনারীর গুণ লক্ষ্য মিলিয়ে পাত্রী নির্বাচন করতে হবে—গৃহিণী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা, সব দিন যাচাই করে দেখতে হবে । সারা জীবনের ধর্মসাপনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয় । ধরে বেঁধে একটা দিয়ে এলেই হ'ল না । শুধু যাবনিক অনাচার চলবে না ।

হাঁ, তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ই । কারণ সৌন্দর্য্য একটা দেবস্বলভ গুণ । এবার যতদূর সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবে চিন্তে কৈলাস ডাক্তার এর পাত্রী দেখে এলেন । অনাদি সরকারের মেয়ে অল্পপমা, সুশিক্ষিতা, সুন্দরী ।

অল্পপমার বয়স একটু বেশী । রোগা বা অতিতরুই দুইই বলা যায় মুখখানি আছে কি না আছে তা বিতর্কের বিষয় । তবে চালচলনে সুরুচি আবেদন আছে নিশ্চয় । রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষা হলাদিনী গুণে ।

প্রতিবাদ করলো রাণু । —না, ম্যাচ হবে না । যা ঝিরকুট চেহার মেয়ের ।

ঋষি বালকের মত কাঁচা মন স্কুমারের । হাঁ না বলা তার ধাতো সম্ভব নয় । কিম্বা অতিরিক্ত লজ্জা, তাও হতে পারে । তবে তার আচরণেই বোঝা গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয় ।

পিসিমা বললেন—ভালই হ'ল । জানি তো, যা কিপ্টে এই অনাদি চাষা । বিনা খরচে কাজ সারতে চায় । পাত্র যেন পথে গড়াচ্ছে ।

সুন্দরম্

দৈবজ্ঞী মশায় এসে পিসিমাকে স্মরণ করিবে দিলেন—পাত্রীর দাশি হ'র গণ, খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসিমা। ওসব কোন তুচ্ছ দবার জিনিষ নয়।

—সবই গ্রহের রূপা। দৈবজ্ঞী সুকুমারের কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ীর ফলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেল। —যা দেখছি তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছে। পতাকারিষ্ট আর নেই, এবাব কেতুর দশা গেলেছে। এই বছরের মধ্যে ইষ্টলাভ—সুন্দরী রামা, রাজপদা ধনসুখা হ'র, আর কত বলবো।

—এই ছুঁড়ি ওখানে কি করছিস্? কৈলাসবাবু ধমকে উঠলেন। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের পাশে বসে আছে তুলসী। হাতে কলাইকরা থালাটা।

বহু কোথেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে হুমকি দিল। —ওঠ, এখান থেকে। রামজাদি! কেমন ঘুপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরে।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাক্, গালমন্দ করিস্নে। পিডকির দোরে গয়ে বসতে বল।

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে বললেন—কি কানাই? এবার অন্যাকে বড়ঘনা থেকে একটু রেহাই দেবে কি না? সুন্দরী পাত্রী জুটলো তোমাদের?

—আজ্ঞে না। চেষ্টার তো ক্রটি করছি না।

—চেষ্টা করেও কিছু হবে না। তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ড কিছু নেই।

—কি রকম?

—কি রকম আবার? চুল কালো হ'লে সুন্দর আর চামড়া কালো

ফসিল

হ'লে কুংসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাস্ত কাকি দিয়ে ?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাস ডাক্তার বললেন—পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি। ধন্তি বাবা কাশীরাম ! একবার ভাব তো কানাই, কোন ভদ্রলোকের যদি নাক থেকে কাণ পর্য্যন্ত ইয়া ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কী চিজ হবে সেটা !

কানাইবাবু বললেন—বা বলেছেন। কত যে বাজে সংস্কারের সাতপাঁচ রয়েছে লোকের। তবে মানুষের রূপের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড অবশ্য আছে, অ্যানথ্রপলজিষ্টরা যেমন বলেন...

—অ্যানথ্রপলজিষ্ট না চামড়াওয়াল। কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন। —আম্বু একবার আমার সঙ্গে ময়না ঘরে। দুটো লাসের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রাল। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ ! মেলা বকো না আমার কাছে।

কানাইবাবু সরে পড়ার পথ দেখলেন।

—জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালোজিভ বলে ডাকে। বর্কর আর গাছে ফলে ? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ভ করে ! আধুনিক হয়েছে ! যত সব ফাজিলের দল !

কৈলাস ডাক্তার ক্ষুদ্র লাল চোখ দুটিকে শাস্ত করে চুরুট ধরালেন।

সত্যদাসের বাড়ী থেকে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুসী মনে কৈলাস ডাক্তার ফিরলেন। ফটকে পা দিয়েই দেখেন, স্কুয়ারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যত্ন আর নিতাই তুলসীর সঙ্গে মস্তুরা করছে।

—এই রাঙ্কেল সব ! কি হচ্ছে ওখানে ?

সুন্দরম্

তুলসী ওর থালা হাতে দৌড়ে পালিয়ে গেল। যদু নিতাই আমতা
• আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বলতে বুথা চেপ্টা করে চুপ করে রইল।
কৈলাসবাবু সুকুমারকে ডেকে বললেন—ঘরের দোর খোলা রাখ কেন ?
সেই ভিথিরি ছুঁড়িটা কদিন থেকে ঘুর ঘুর করছে এদিকে। খুব নজর
দাখবে, কখন কি চুরি করে সরে পড়ে বলা যায় না।

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাসবাবু জানালেন—সত্যদাসের মেয়ে
মমতাকে দেখে এলাম। একরকম পাকা কথাই দিচ্ছে এসেছি। এবার
সুকুমার আর তোমরা একবার দেখে এস। আমায় আর নাকে দড়ি
দিয়ে ঘুরিও না।

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হলো। মমতার রূপে অসাধারণত্ব
আছে সন্দেহ নেই। ঘুটঘুটে অমাবস্তার মত ঘনরুম গায়েব রং। সমস্ত
অবয়বে সুপেশল কাঠিন্য। মণিবন্ধ ও কল্লুয়ের মজবুত অস্তিত্বের আশ
হাতপায়ের রোমঘন পাকগু পুরুষকে ও লজ্জা দেয়। চণ্ডা করোটির
ওপর অতিকুঞ্চিত স্থলতন্তু ঢলের ভার, নীলগিরির চড়ার ওপর স্নিগ্ধ
মেঘস্তবকের মত। এক দৃঢ় দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তি। মমতার প্রথম
দৃষ্টির সামনে সুকুমারই সঙ্কচিত হ'ল। বরমালা-কাঙাল অবলার দৃষ্টি
এ নয়; বরং এক অকুতোলজ স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসাই যেন জল্জল্ করছে।

সত্যবাবু মেয়ের গুণপনার পরিচয় দিলেন। —বড় পরিশ্রমী মেয়ে,
কারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছাত্রীজীবনে প্রতি বছর স্পোর্টে প্রাইজ
পেয়ে এসেছে।

মেয়ে দেখে এসে সুকুমার মুখভার করে শুয়ে রইল। রাগু বললো—
এ নিশ্চয় রাক্ষসগণ পিসিমা।

পিসিমাও একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন—হাঁ, সেই তো কথা। বড় হট্টা
কট্টা চেহারা। নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দানসামগ্রীও।

ফসিল

তবু কৈলাস ডাক্তার তোড়জোড় করছেন। মমতার সঙ্গেই বিয়ে এক রকম ঠিক। এবার একটু শক্ত হয়েছেন তিনি। দশজনের দাখিল কথার চক্রে আর ভুত সাজতে পারবেন না।

কিন্তু যা কখনও হয়নি তাই হ'ল। স্বকুমারের প্রকাশ্য বিব্রোহ। স্বকুমার এবার মুখ খুলেছে। রাগকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে—সত্য দাসের সঙ্গে বড় গলাগলি দেখছি বাবার। ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগে ভাগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সান্ত্বিত নিচ্ছি।

কথাটা শুনে পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। স্বকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুর সঙ্গে একপ্রশ্ন বাক্যগুচ্ছ সেরে এলেন। কিন্তু ফল হ'ল না কিছুই। কৈলাসবাবু এবার অটল।

স্বকুমারের মা কেঁদে ফেললেন—ঐ হৃদকুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়ের ছায়া মাড়াবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিমটে দিয়ে বিদেয় করে দাও না!

কৈলাসবাবুর অটলতার ব্যতিক্রম হ'ল না কিছুই। তিনি শুধু একটা দিন স্থির করার চেষ্টায় রইলেন।

স্বকুমার মারমুর্তি হয়ে রাগকে বললো—সেই দৈবজ্ঞীটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তো!

—কোন দৈবজ্ঞী?

—ঐ যে-বেটা স্মন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলবো ওর।

আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাস ডাক্তার শুনলেন এ বার্তালাপ। রাগে ব্রহ্মতালু জলে উঠলো তাঁর। স্বকুমারের মাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—কি পেয়েছ?

সুন্দরম্

শক্তি চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন—
কি হয়েছে ?

—ছেলের বিয়ে দিতে চাও ?

—কেন দেব না ?

—সংপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও ?

সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—সুন্দরী পাত্রী।

—বেশ, তবে লিখে দাও আমাকে সুন্দরী কাকে বলে। তব্বী গ্রামা
পক্ষ-বিশ্বাধর—আরও যা আছে সব লিখে দাও। অ'মি সেই কদ্দ মিলিয়ে
পাত্রী দেখবো।

এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমারের মার মেজাজও দৈব্যা হারাবার
উপক্রম করলো। তবু মনের ঝাঁঝ চেপে নিয়ে ব'ললেন—তার চেয়ে ভাল,
তোমায় পাত্রী দেখতে হবে না। আমরা দেখছি।

—ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। এবার তা হ'লে অ'মি দায়মুক্ত ?

—হ্যাঁ !

কৈলাস ডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছেন। হাসপাতালে যান
আসেন। রুগী নিয়ে, ময়না ঘরের লাস নিয়ে দিন কেটে যায়। যেমন
আগে কাটতো।

বাগানের দিকে একটা হট্টগোল। কৈলাস ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে
দেখেন, যদ্‌ ভোম আর নিতাই মিলে তুলসীকে ঘাড় দরে হিড় হিড় করে
টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

—কি ব্যাপার নিতাই ?

—বড় পাজি এ ছুঁড়িটা হুজুর। পয়সা দেয়নি ব'লে দাদাবাবুর ঘরে
তিল ছুঁড়ছিলো। আর, এই দেখুন আমার হাত ক'মড়ে দিয়েছে।

ফসিল

কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় বাড় বেড়েছে ছুঁড়ির। ভিগিরীর জাত দয়া করলেই কুকুরের মত মাথায় চড়ে। কেবলই দেখছি মাস তিন চার থেকে শুধু এদিকেই নজর। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবি।

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়েও মত্তা বাতুলীর মত আরও কটা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে চলে গেল। কৈলাস ডাক্তার বললেন—সব সময় ফটকে তালা বন্ধ রাখবে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা। অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ী ফিরতেই কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে টিপে সরে পড়ছে তুলসী। কৈলাসবাবুকে দেখে আরও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হাঁক দিতেই যত্ন ও নিতাই হাজির হ'ল লাঠি হাতে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—এ কি? ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, স্কুুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা; তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা বেমালুম চুরি করে সরে পড়লো!

কৈলাস ডাক্তার সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলেন। —আমার ঘরটা সব তছনছ করেছে কে? টেবিল থেকে নতুন বেলেডোনার শিশিটাই বা গেল কোথায়?

অনেকক্ষণ বকাবকি করে শাস্ত হলেন কৈলাস ডাক্তার। কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হ'ল।

দিনটা আজ ভাল নয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দুর্ঘোষণা ঘনিয়ে আছে। কানাইবাবু এসে কৈলাস ডাক্তারকে জানালেন—সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গেছে। জগৎ ঘোষের মেয়ে। স্কুুমারের এবং আর সবারও পছন্দ হয়েছে। বংশে, শিক্ষায় ও গুণে কোন ক্রটি নেই।

সুন্দরম্

কৈলাস ডাক্তার বললেন—বুঝলাম, তোমরা কল্পতরুর সন্ধান পেয়েছ, সুখবর।

—আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্বাদ করতে যেতে হবে।

—তা, যাব।

যত্ন ডোম এসে তখন খবর দিল তিনটে লাস এসেছে মঘনা তদন্তের জন্ত। কৈলাস ডাক্তার বললেন—চল্ রে যত্ন। এগনি সেরে রাখি। রাত্রে আমার নানা কাজ রয়েছে।

মঘনা ঘরে এসে কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় মেঘলা করেছে বে। পেটোমাক্স বাতি দুটো জ্বাল।

যত্নপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আন্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—রাত হবে নাকি রে যত্ন?

—আজ্ঞে না। দুটো আগুনে পোড়া লাস, পচে পাক হয়ে গেছে। ও তো জানা কেস, আমিই চিরে ফেড়ে দেব। বাকী একটা শুধু...।

—নে কোনটা দিবি দে। কৈলাস ডাক্তার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

লাসের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাস ডাক্তার চমকে বললেন—আঁা, এ কে রে যত্ন?

যত্ন ততক্ষণে আলগোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাস ডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বললো—হাঁ হজুর তুলসীই, সেই ভিথিরি মেয়েটা।

কৈলাস ডাক্তার বোকার মত যত্নর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যত্ন সেই অবসরে তুলসীর পরিহিত নোংরা সাড়ীটা, গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাচ্ছি কোথায়?

ফসিল

স্পিরিট দিয়ে লাসটা মোছ ভাল ক'রে। ইউক্যালিপটাসের তেলের বোতলটা দে। কিছু কপূর পুড়তে দে, আর একটা বাতি জ্বাল।

—One more unfortunate !

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিল। তুলসীর লাসে হাত দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

করাতের দু'পোচে খুলিটা ছুভাগ করা হ'ল। কৈলাস ডাক্তারের হাতের ছুরি ফৌস ফৌস ক'রে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চললো লাসের ওপর। গলাটা চিরে দেওয়া হ'ল লম্বালম্বি ভাবে। বুকের মাঝখানে ৮ দুপাশে বড় বড় পোচ দিয়ে ধড়টা খুলে ফেলা হ'ল। সাঁড়াশী দিয়ে পটপট করে পাজরাগুলো উন্টে দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাস ডাক্তার দেখলেন—নিশ্চল দুটি বণীনিকা যেন নির্দ্বন্দ্ব কোন অভিমানে নিম্ভ্রভ হয়ে আছে। শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের খেত পটল। স্জলা অশ্লীলা নাড়ীগুলো অতিশ্রাবে বিষন্ন।

—ইস্, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাস ডাক্তার বললেন।

যহু বললো—হাঁ ছজুর, কাঁদবেই তো। স্জইসাইড কি ন'। করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।

—গলা টিপে মারে নি তো কেউ ? কৈলাস ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কৈ কোন আঘাতের চিহ্ন তো নেই ! গুচ্ছ গুচ্ছ অগ্নান স্বরজ্জ্ব, শ্বাসবহা নালিটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল স্পুষ্ট এসনিকা।

—এত লালা ! মরার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরে।

সুন্দরম্

—হাঁ হুজুর, ভিথিরি তো খেয়েই মরে।

দেহতত্ত্বের পাকা জহরী কৈলাস ডাক্তার। তাঁকে অবাক করেছে আজ কুংসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধ, কত রূপাজীবী নটীর লাস পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ—ফিকে ক্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত !

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন— প্রবাল পুষ্পের মালঙ্কের মত বরাদ্দের এই প্রকট রূপ, অচন্দ্ৰ মাহুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্তে ডুব দিয়ে আছে সুস্বাদু কৈশিক জল।

কৈলাস ডাক্তার বিমুগ্ধ হয়েই দেখলেন—থরে বিথরে সাজানো সারি সারি যত রক্তিম পশুকা। বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাস ডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিলেন— থণ্ডফটিকের মত পীতাম্ব ছোট বড় কত গ্রন্থির বৌথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনী! সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বৃদ্ধ। গ্রন্থিস্থীরে নিযুক্ত অতি অভিরাম এই অংশুপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা। ঝাঁপি গোলা রক্তমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাস ডাক্তার। কুংসিতা তুলসীর ঐ রূপের পরিচয় কে রাখে! তবুও, এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদা। নতুন তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন! যাক্……

ফসিল

কৈলাস ডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যত্ন বললো—
এ সব কে কোন জখম নেই ছজুর। পেটটা দেখুন।

ছুরির ফলার এক আঘাতে দু'ভাগ করা হ'ল পাকস্থলী। এইবার
কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাথা
একটা অজীর্ণ পিণ্ড। সন্দেশ, পাউরুটী—বেলেডোনা।

—মার্ডার!

হাতের ছুরি খসে পড়লো মেঝের ওপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে
দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাস ডাক্তার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাস ডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো দপ দপ
করে। পোথরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে
ঝরে পড়লো মেঝের ওপর।

হঠাৎ ছটফট করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাস
ডাক্তার। ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো
বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিম্‌টের সূচিক্কন বাছপুটে চেপে
নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে খুলে ধরলেন—পরিশুদ্ধ
ঢাকা স্ফুডোল স্নকোমল একটা পেটিকা। মাতৃদেহের রসে উর্বর মানব
জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত, বিষিয়ে
নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।

আবেগে কৈলাস ডাক্তারের ঠোঁটটা কাঁপছিল থর থর করে। যত্ন
এসে ডাকলো—ছজুর।

ডেকে সাড়া না পেয়ে যত্ন বাইরে গিয়ে নিতাই সহিসের পাশে
বসলো।

নিতাই বললো—এত দেবী কেন রে যত্ন?

—শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

সবলা

ডোমেদের প্রধান গাঁওবুড়া এলাচি ডোম। যৌবনের জলুস উবে গেছে কবে, ছুরির মত সে-জীবনের ধার গেছে ক্ষয়ে, পরমায়ুর প্রাস্তে এসে ঠেকেছে আজ। জরা আর ভীমরতির পাকে প'ড়ে ধুকপুক করছে শুধু। যাই যাই করেও যেন আর যেতে চায় না।

মোরগের ডাকের সঙ্গে এলাচির ঘুম ভাঙে। জেগে উঠেই পরিত্রাহি চোঁচাতে থাকে—টুকিয়া, ওরে টুকিয়া, শিগগির ভাত দে।

—এক লাথি মেরে সব গলাবাজি বন্ধ করে দেব বুড়ো। শুধু থাই আর থাই। নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খা না।

টুকিয়াও ঘুম ছেড়ে রাগে গরগর করে বেরিয়ে যায়। গাঁওবুড়ো এলাচি তার অষ্টাবক্র গ্রন্থিল দেহভার তুলে দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। কঞ্চি দিয়ে গা চুলকোয়। মাথাটা ঘড়ির কাঁটার মত প্রতি সেকেন্ডে ঠক ঠক করে কাপে। গাল দেয় টুকিয়াকে, গাল দেয় টুকিয়ার মৃত্যু মাকে, যার চরিত্র নাকি কোন কোলিয়ারির সাহেবের কাছে বাঁধা ছিল। —নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই বেজন্মা, নইলে বুড়ো বাপকে এত অবহেলা!

এলাচির গালাগালি আর অভিশাপের প্রবাহ অবিরল ধারায় গড়িয়ে চলে ছুপুর পর্যন্ত। শ্রান্তিতে ঘৃণধরা ধড়টা ক্রমে নিশ্চল হয়ে আসে। ডাঙায় তোলা মাছের মত থাবি থায়।

এমনি সময় ঘরে ফিরে আসে টুকিয়া। বুড়োর স্তম্ভগে ঠেলে দেয় এক থালা ভাত আর এক হাঁড়ি তাড়ি বা মদ। বুড়ো জ্বত ক'রে উঠে বসে। বিশীর্ণ ঘাড়টা সারসের মত ঝুঁকিয়ে অন্তর্ভব করে—এক হাঁড়ি তরল প্রাণের গন্ধ। এই জ্বন্তুই তার বেঁচে থাকা।

ফসিল

—জিতা রহে। বেটা। বুড়ো টুকিয়াকে আশীর্বাদ করে। —তুই আছিস বলেই তোর বুড়ো বাপটা বেঁচে আছে। বুড়ো ডুকরে কেনে কলে। —আর তোর মা। অমন বউ দেবতারও হয় না রে টুকিয়া ! বুড়ো ভাতের থালা সামনে টেনে নেয়।

ছু' তিন মুঠো ভাত গিলে ক্লান্ত ঘোড়ার মত তাড়ির হাঁড়িতে ঠোঁট নামিয়ে দেয়। চকচক ক'রে খেয়ে ফেলে। থেমে নিয়ে তামাক টানে।

তাড়ি ভেজা নো'রা দাড়িতে মাছি উড়ে এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। ঠাণ্ডা ভাতের থালায় গা বেয়ে চড়ে পিঁপড়ের সারি। বুড়ো বৃন্দ হুড়ে ঝিমোয়। তার সাদা ভুরু দুটো চোখের কোর্টরের ওপর পদ্মার মত ঝুলে পড়ে।

এত দীনতা এলাচির সংসারে আজই দেখা দিয়েছে, চিরটা কাল এমন ছিল না। সেণ্ট্রাল জেলের জহ্লাদ ছিল এলাচি—মাইনে ছিল ভাল, উপরি আয়ও মন্দ হ'ত না। সব চেয়ে মোটা দক্ষিণা আদায় হ'ত ফাঁসির আসামীর মায়েদের কাছে।

মায়েরা বলত, দোহাই বাবা জমাদার! টানা-হ্যাঁছড়া ক'রে ছেলটাকে শেষ সময়ে আর কষ্ট দিস্নি বাবা !

—তা একটু করতে হবে বৈকি। সহজে কি আর কেউ তক্তায় উঠতে চায়, মায়িজী।

—না রে বাবা জমাদার। নে, বিশটা টাকা রাখ, এই রূপোটা নে। কিন্তু কথা রাখিস।

এলাচি খুশী হ'য়ে আশ্বাস দিত। —বেশ, বেশ, দড়িটানা হয় চবিতে ভিজিয়ে নেব ভাল ক'রে, যাতে গলার চাম টাম ছ'ড়ে না যায়। তবে আগে দুটো টাকা দাও—আমার মেয়ে মেঠাই খাবে।

সবলা

এ-সব অনেকদিন আগের কথা। টুকিয়া তখন ছ বছরের মা-মরা শিশু।

ভাত আর তাড়ি। এই সামান্য অন্নপানটুকু গাঁওবুড়া হিসাবে তার প্রাপ্য দক্ষিণ। কিন্তু কেই বা আর শ্রদ্ধা ক'রে খুশী মনে দেয়। ভোম গৃহস্থদের দ্বার হ'তে দ্বারে ঘুরে, অন্ননয় ক'রে, চোখ রাঙিয়ে, ঝগড়া ক'রে টুকিয়া আদায় ক'রে আনে গাঁওবুড়োর এই সম্মান।

ভিক্ষাজীবী ভোম মেয়েরাও টুকিয়াকে অন্তকম্পার চোখে দেখে। তাদের বরাতেও ভালকুটি জোটে। টুকিয়া সম্মানী যা পায়—তারাপ্রাপ্য দেখে লজ্জা পায়।

সমবয়সী ভিথরী মেয়েরা ঠাট্টা ক'রে বলে—বুড়োকে এবার একটি জামাই আনতে বল না টুকিয়া। তা হ'লেই তো তোব এ মেহমতের জ্বালা দূর হয়।

টুকিয়া তাদের গালে ঠোনা মেরে জানিয়ে দেয়—বুড়োর দেওয়া জামাই আমি নেব কেন? আমার বর বাছব আমি।

টুকিয়া চলে গেলে ভিথরী মেয়েরা আলোচনা করে। তারাপ্রাপ্য সে কথাটা শুনেছে। টুকিয়া জ্বাতির বাইরে কার সঙ্গে ফেসেছে। পঞ্চের বৈঠকে এর নিষ্পত্তি হবে। টুকিয়াকে শাস্তি পেতে হবে।

গাঁয়ের সবারই চোখে টুকিয়া সুন্দর। পরবের দিনে খোলা মাঠে নৃত্যপরা টুকিয়ার তনুফুটি আড্ডার চোখে চোখে কুহকবাস্প বুলিয়ে দেয়। বয়োবুদ্ধেরাও আফসোস করে—ভাল লাচনী হ'ত হে মেয়েটা, চাল-চলন যদি একটু নরম সরম হ'ত। সব মাটি করেছে ওর ঐ কুদ্রা স্বভাব—কনকধুতুরার মত। দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকাই যায়।

নতুন এক জোয়ান এসেছে এ গাঁয়ে। মঙ্গল তার নাম। গাঁয়ের ওঝা তাকে দিয়েছে আশ্রয়। কিন্তু ধরা পড়ে গেল মঙ্গল। আসলে সে

ফসিল

ডোম নয়—মুণ্ডা জংলী। তার ওপর আরও খবর পাওয়া গেছে—সে ডাইনীর ছেলে। দেশ ছেড়ে এসে রয়েছে ডোম সেজে, চাকরি জোটাবার ফন্দিতে।

এ হঠকারিতার যথোচিত শাস্তি পেতে হ'ল মঙ্গলকে। ডোমেরা নিদারুণভাবে পিটিয়ে তাকে গাঁয়ের বার ক'রে দিল! ডাইনীর ছেলে গেল বটে, কিন্তু ষাবার আগে তুক্ ক'রে রেখে গেল গাঁয়ের সেরা জিনিসটি—যুবক-ডোমের কামনার ধন ওই টুকিয়াকে। এ ব্যাপারে সমস্ত গা জুড়ে যে বিক্ষোভের ঝড় উঠল, তার ছের আজও মেটেনি, মিটছেও না।

গাঁয়ের সীমানার বাইরে, নালার ওপারে এক শিমূল গাছের তলায় কুঁড়ে বাঁধলো মঙ্গল। নড়বার নাম নেই, মঙ্গল মুণ্ডা যেন চুষ্টগ্রহের মত ঝুলে রইল ডোম গাঁয়ের দিগন্তে। কুকুর-মারা ঠ্যাঙ্গা হাতে ডোমেরা ক'দিন রইল তাকে-তাকে। বাগে পেলো এক বাড়িতে তার প্রণয়কলাপ আর ইহলীলা একই সঙ্গে ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু বেটা জংলী বড় জবরদস্ত, তার ওপর সর্বদা খোঁপায় ঝোলানো এক গোছা বিষ-মাখানো তীর। উড়ন্ত সাপের মত অলক্ষ্যে কখন কাকে এসে ছোঁবল দেবে কে জানে! কাজেই সংঘর্ষটা তেমন জমে উঠল না। ওঝার বহুদিনের মন্তরবন্দী অশরীরী পিশাচটাও জংলীকে ঘায়েল করতে পারল না।

প্রতিবেশীরা দলে দলে এসে বুড়ো এলাচিকে শুনিয়ে দিয়ে গেল—গাঁওবুড়া, হয় মেয়ের বিয়ে দাও, নয় মেয়েকে সামলাও। নইলে তোমাকে জ্বাতে রাখা আর সম্ভব হবে না। আমাদের অগ্র গাঁওবুড়া দেখতে হবে।

প্রতিবেশীদের হাত ধরে সন্ধ্যার বুড়ো বলে—কেন বেরাদার, তোমরা এত চটেছ কেন? কি করেছে মেয়েটা?

সবলা

—কি করেছে ? রাত বেয়াতে মঙ্গলের সঙ্গে ঘুর ঘুর করছে । একে ভাত পৌছয়, শলা-পরামর্শ দেয়, সমস্ত পঞ্চ বিগড়ে উঠেছে এসব কুকাণ্ড দেখে । জাতের বাইরে……ছি ছি ।

পঞ্চের গুপ্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হ'ল—মঙ্গলকে দ্রব কর । টুকিয়া একে ভাত পৌছতে পারবে না । গাঁওবুড়াকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে, এর ব্যতিক্রম হ'লে তারা একজোটে সম্মানী দেওয়া বন্ধ করবে ।

গাঁওবুড়া এলাচিও ক্ষেপে গেছে । গেল গেল, সব গেল । বন্ধ হ'ল তার ভাত আর মদ । ওঝার হাত ধ'রে মিনতি ক'রে বলে—সবর কর দোস্তু । সব ঠিক হয়ে যাবে । বুড়াকে পেটে মের না বেয়াদার । পঞ্চ ভুলে যেও না ।

প্রত্যুত্তরে ওঝা আশ্বাস দিয়ে জানায়—সে পঞ্চজ্ঞান আমাদের আছে ! কিন্তু বেটিকে বুঝিয়ে দাও, জংলী শালা যেন মোটা না হ'তে থাকে আমাদেরই ভাত মেরে ।

—টুকিয়া শোন্ বেটী ! এলাচি আদর ক'রে ডাকল । —পঞ্চের সভা এল বলে । তোর বর বাছাই হবে সেদিন । ওঝাব ছেলের সঙ্গেই ঠিক করেছে ! পঞ্চের সামনে গিয়ে কবুল ক'বে নিবি । বুঝলি ?

টুকিয়া সংক্ষেপে জানিয়ে দিল—সে আমি পারব না ।

—কি পারব না ? বুড়া দারোগাই মেজাজে গলার স্বর এক পদ্দা চড়াল ।

—কি আবার রে বুড়া ? যেন জানিস না কিছু ? আমি মঙ্গলকে কথা দিয়েছি ।

—কি ? মঙ্গল ? জাতের বাইরে ? হ'সিয়ার হো যাও হারাম-জাদী ! নইলে এই বেত দিয়ে ফাঁসিয়ে ঘাড়টা একেবারে মুচড়ে দেব ।

ফসিল

নিম্নলিখিতচক্ষু বুড়োর মুখের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে ধরে টুকিয়া বলল,—
এই দেখ, হেই বুড়া! এই করবি তুই।

বুড়ো অবশ হাতে তার দুপাশে হাতড়ে দেখল—চেলাকাঠ, লাঠি বা
ইট-পাটকেল। ততক্ষণে টুকিয়া ঘরের বাইরে।

সমস্ত দিন মাঠে মাঠে ঘুরেছে মঙ্গল। গেরুয়া ধূলায় শরীর গেছে
ছেয়ে। মাটিতে একেবারে লুটিয়ে শুয়ে সে টুকিয়ার কথাগুলো গিলছিল।
সামনে পলাশের একটা নীচু ডাল ধরে টুকিয়া হেলে ছুলে বকে
চলেছে।

—কাল থেকে তোর ভাত বন্ধ।

—বেশতো, জঙ্গলের ডুমুর খাব।

—হাঁ, তাই খাবি।

—বলছি তো খাব। রোজ ডুমুর খাব। কিন্তু একদিন এসে দেখবি
আমি আর মঙ্গল নই। ভালুক হয়ে ঝুলছি ডুমুরের ডালে। এই রোঁয়া,
এই নখ, এই থাবা……

মঙ্গলের অভিমানের প্রলাপ থামিয়ে দিল টুকিয়া। পায়ের চেটো
দিয়ে মঙ্গলের ধূলো ছাওয়া পিঠটা আস্তে আস্তে ঘষে দিয়ে বলল—বড়
ঘাবড়ে গিয়েছিস্, না রে মঙ্গল? ভয় কি তোর? আমি রয়েছি। তবে
তোকে কাজ করতে হবে।

চারিদিকে সাবধানী দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে গলার স্বর নামিয়ে টুকিয়া
বলল,—রোজ রাত্তিরে একটু দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। বল রাজি
আছিস্?

—হাঁ।

—মাঠে মাঠে যাবি। খবরদার সড়ক ছুঁসনা যেন। লোহার

সবলা

পুলটা পেরিয়ে দেখবি কুলের বাগিচা। পেছনের ঘেরান ভেঙে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়বি। বেছে বেছে লাক্ষার গুটিভরা এক বোঝা ডাঁটা নিয়ে আয়। মারোয়াড়ী ঠিক করেছি। এক এক বোঝা পাচ পাচ টাকা।

মাঝরাত্রে মঙ্গল ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। তার রক্ত মাথা দেহটা পলাশতলায় কাটাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল। পিঠে বল্লমের খোচা-লাগা একটা স্নগভীর ক্ষত। —দারোয়ানে ঘিরেছিল বে টুকিয়া। উঃ, কোন মতে পালিয়ে এসেছি।

চালে ভুল হয়েছে। টুকিয়া ভাবনায় ডুবে রইল কতক্ষণ। এ পথে চলবে না রোজগার। প্রতিপদে মরণ আর জেল। জালীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর সে হ'তে পারবে না।

নতুন রোজগারের হৃদিস দিল টুকিয়া। —রিজার্ভ জঙ্গল থেকে মরা জানোয়ারের হাড় কুড়িয়ে নিয়ে শহরে গিয়ে বেচে আয়।

ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে অরণ্যে ঘুরে হাতড়ে বেড়ালো মঙ্গল। একটা পুরনো উইটিবি খুঁড়ে বাস করল গোটা চারেক পাহাড়ী ভোমনার মেরুদণ্ড। মরা কেঁদগাছের ঝোপে পেল ড'ঝাড় হরিণের শিং। শ্রোতের ধারে বালিতে আধপোতা নীলগাইয়ের পাজরাও পেল একটা।

হাড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে জঙ্গলের গাছের ভিড় ঠেলে খোলা জমিতে পা দিতেই মঙ্গলের একেবারে মুখের ওপর এসে ঠেকল একটা ফেনসিক্ত ঘোড়ার মুখ। অস্বীকৃত জঙ্গল-দারোগা।

—লাইসেন্স ?

হতভম্ব মঙ্গল হাড়ের প্রকাণ্ড বোঝাটা মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ফসিল

—কি বে শ্বশুরকা নাতি ? তোর বাপের এটা ?

মঙ্গলকে সদরে চালান করা হ'ল ! সপ্তাহ পরে খবর এল—কয়েদ, ছ'মাসের জন্ত ।

মঙ্গলের কুঁড়ের খুঁটি ধরে টুকিয়া কাঁদল । —বড় বেইজ্জৎ হ'ল বেচারী । আর হয়তো আসবে না । বয়েই গেল তাতে । ডোমগাঁয়ে কি আর জোয়ান নেই—সূর্য্য, বংশী, বিদেশী...

মঙ্গল মুণ্ডা জেলে । ডোমগাঁয়ের প্রজ্জ্বলিত সামাজিক উত্তাপ ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে । টুকিয়ার পাণিপ্ৰার্থী ডোমমহলে স্থপ্ত ভরসা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে । সাপ সরে গেছে মালঞ্চ ছেড়ে । অনেকগুলো হাত এগিয়ে এল এক সঙ্গে ।

এল ওঝার ছেলে সূর্য্য ডোম । হাসপাতালের টি. বি. ওয়ার্ডের মেথর । গাঁওবুড়ার পা টিপে দিয়ে নিবেদন করলো—বাবা, এইবার ব্যাপারটা চুকে যাক । আর দেবী নয় ।

এল মশান মজুর বিদেশী ডোম । মড়ার লেপতোষকের তুলো আর নেবানো-চিতের কাঠকয়লা বেচে পয়সা জমেছে কিছু । ঘরে বসে রেজকি-ভরা পেতলের ঘটি ক'টার দিকে তাকায় আর একটি গৃহলক্ষ্মীর জন্তে মন আনচান করে । বুড়োকে এক বোতল বিলিতী মদ প্রণামী দিল ।—এইবার টুকিয়ার সঙ্গে মস্তুর পড়ে হাত মিলিয়ে দাও বাবা ।

মননাঘরের দারোয়ান বংশী ডোম এল । কত কচি ছেলেমেয়ে, মাগী-মরদ, ইংরেজ বাঙালীর লাস পার হয়েছে তার হাত দিয়ে । বেওয়ারিশ লাসের গা থেকে খুলে নেওয়া হাঁসুলি, চুড়ি, তাগা, হার—কত সামগ্রী ! তার তামার গাগরিটা প্রায় ভরে এল । সটান বুড়োর পা জড়িয়ে ধরে বিয়ের প্রস্তাব জানাল । —একটু তাড়াতাড়ি কর বাবা ।

সবলা

বুড়ো এলাচিও মর্মে মর্মে বুঝে নিয়েছে যে তার বান্ধকোন একমাত্র নির্ভর একজন সুযোগ্য জামাই। নইলে, মদের অভাবে তার সুমুগ্ধ এই এমন সরস পৃথিবীটা শুকিয়ে শুঁড়ে হয়ে যাবে। কাউকেই হাতছাড়া করতে চায় না বুড়ো। সবাইকে সাগ্রহে আশ্বাস দেয়—সবর সবর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঙ্গলের মুক্তির দিন এগিয়ে এল। ডোমগায়ের প্রস্তুত বিক্ষোভ আবার শত শিখায় জলে উঠল। পঞ্চের বড় বৈঠক হ'ল—চড়াশু নিষ্পত্তি হবে এইবার।

এলাচির যুক্তি বুদ্ধি ষেটুকু ছিল তাও এল যোলা হয়ে। চোপের সামনে জাত ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে মেয়েটা। তাও কি না আবার একটা জংলী শেয়ালের সঙ্গে। হায় পরমাত্মা! কোন কাজেই আসবে না। গাঁওবুড়ার আসন এবার সত্যি টলে উঠল।

নেশায় আজকাল আর সে আমেজ আসে না। মাথায় কেমন জালা ধরে। —ভেজাল মেরেছে শালারা সব! জল মিশিয়েছে। বুড়ো মদের ভাঁড় লাথি মেরে হঠিয়ে দেয়।

আগামী পঞ্চের বৈঠকেই হবে তার মৃত্যু। গতাত্মর নেই। ধরে একটা চণ্ডা মেয়ে আর বাইরে ক্ষমাহীন পঞ্চ।

এলাচির মনে পড়লো হিজরে কাশী ভোমের পরামর্শটা। —ই, কাশী কথাটা মন্দ বলেনি।

—টুকিয়া, টুকিয়া, টুকিয়া। বুড়ো গলা চিরে ডেকে ডেকে কেঁদে ফেলল। —জাত ছাড়বি তুই?

—ই।

—আমি খাব কি?

—তা আমি কি জানি। মরিস না কেন?

ফসিল

—অবুঝ হোস্ না বেটি। যদি জাতই ছাড়বি তো জংলীটার জন্তে কেন ?

—কার জন্তে ছাড়ি বলতো ?

—কাশী একটা খবর দিচ্ছিল। শুনবি ? বুড়ো যথাসাধ্য তার গলার স্বর কোমল করে নিয়ে বলল—বানার্জী ডাক্তারের বাড়ী কাজ করবি ? টাকা পয়সা ভালই পাবি। সামান্য ঝাড়ু টাছু দিতে হবে।

—ওসব আমি পারব না বুড়ো। মঙ্গলের ছেলে রয়েছে আমার পেটে।

আহত নেকড়ের মত বুড়ো বিস্ত্রী চীৎকার ছাড়ল—কি ? কি বললি রে ধর্মহারা মেয়ে ?

এবার টুকিয়া হেসেই ফেলল। —নে বুড়ো খুব হয়েছে, থাম এবার। যত মদ খাবি, যত ভাত তামাকু খাবি সব দেব। তোর আর পঞ্চকে অত ভয় করতে হবে না। কিছু ভাবতে হবে না তোকে। ওদেব জবাব দিয়ে দে।

—জিতা রহো বেটি। বুড়ো টুকিয়াকে আশীর্বাদ করে। অবসন্ন বুড়ো ক্রমে ঘুমের ঘোরে নেতিয়ে আসে। টুকিয়া এক টুকরো চট পাকিয়ে এলাচির মাথার তলায় গুঁজে দেয়। গামছা দিয়ে বুড়োর গা মুছে হাত পায়ের আঙুল টেনে বাজিয়ে দেয়। —ঘুমো বুড়ো ঘুমো। দুটো ভাত আর মদ, এই তো ? এইটুকু যদি না করতে পারি তবে আমি ডোমিন নই।

টুকিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে। তার চেতনা ছাপিয়ে জেগে ওঠে পুরাণমানবীর মাতৃতান্ত্রিক দর্প।

গায়ের সীমানা ছাড়িয়ে টুকিয়া মাঠের ধারে এসে দাঁড়াল। আজই তো তার খালাস হবার কথা।

সবলা

স্বর্গা ডুবেছে অনেকক্ষণ। ধানকাটা ক্ষেত ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তিত্তির উড়ে চলেছে। পলাশতলার কুঁড়েটা একেবারে ধসে গেছে।

মৌরীবনের কিনারায় দাঁড়িয়ে গুল্‌তি ছুঁড়ে কে? ইঁ, সেট তো!
—আর বসে বসে গুল্‌তি ছুঁড়লে চলবে না। রোজগার করবি তো কর।
নইলে আমার আশা ছাড়।

এতদিন অদেখার পর এই রুঢ় সন্তুষ্ট। মঙ্গল টুকিয়ার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

—আচ্ছা, ভাবিস্‌ না। কাল আনাব সঙ্গে সহবে যাবি। হাসপাতালে পাংখা কুলির দরকার।

সদর শহর। জংলীর মুখে শব্দ নেই। সব বাগাট টুকিয়াকেই এক। ভুগতে হ'ল। —যা, ঐ যে বাবুটা বসে আছে দোকানে, তাকে গিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে দিতে বল। এমনি করে আদাব জানাবি।

টুকিয়া সবই শাসিয়ে শিথিয়ে দেয়, মঙ্গল এগিয়ে যায় আর বিমুগ্ধ হয়ে ফিরে আসে। —অপদার্থ জংলী কোথাকার? আয় আমার সঙ্গে।

—বাবুজী! ঠেঁট ভুটো পাতলা হানিতে রাঙিয়ে নিয়ে, কালো চোখের তারা ভুটো নাচিয়ে বাবুটির প্রায় গা ঘেসে দাঁড়িয়ে টুকিয়া বলে—
বাবুজী! একটা দরখাস্ত লিখে দাও!

লেখা দরখাস্তটা নিয়ে টুকিয়া মঙ্গলের হাতে দিল। —এই নে, এবার হাসপাতালে চল।

হাসপাতালের কেরাণীবাবুর সামনে দরখাস্তটা সঁপে দিয়ে মঙ্গল দাঁড়াল।

—আঁ মুণ্ডা? তোম্‌ মুণ্ডা হয়?

—হজুর।

—যাও থানাসে সার্টিফিকেট লে আও। আচ্ছা দাঁড়াও।

ফসিল

টেলিফোনের চোঙটা তুলে নিয়ে কেরাণীবাবু ডাকলেন—হ্যালো সাবইনস্পেক্টর। একবার রেজিষ্টারটা দেখুন তো। নাম মঙ্গল মুণ্ডা—কোন ব্যাড ক্যারেক্টার কি না।

—ওরে বাবা! এ যে দেখছি সর্বগুণাধার নরোত্তম। সি ক্লাস দাগী। সাবইনস্পেক্টরের প্রত্যুত্তর এল।—বাধা ভালুকের মতিগতি তবু বোঝা যায় মশাই, কিছু এসব জংলী ফংলী

ফোন নামিয়ে কেরাণীবাবু বললেন,—এই মঙ্গল মুণ্ডা, কেটে পড় বাবা। তোমু দাগী ছায়! নোকরি নেহি হোগা।

মঙ্গলের বক্বর মস্তিষ্কে বোধগম্য হ'ল না কিছু! টেলিফোনের চোঙটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে তার সমস্ত শরীর রিম্‌ঝিম্‌ করে উঠল। প্রেতের ভেঁতা মুখের মত ঐ বস্তুটা এখনি এক ফ'য়ে যেন তার চোখের সব আলোটুকু নিভিয়ে দেবে।

অস্তুরালবর্দিনী টুকিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনল। আচম্‌কা এসে রুচুমুষ্টিতে মঙ্গলের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে।—চল্‌ বন-বিড়ালের বেটা। তোকে আর চাকরি করতে হবে না।

নিঃশঙ্কিনীর প্রত্যেকটা অভিযান নিদারুণ নিফলতায় একে একে লুটিয়ে পড়ছে ধুলোয়। টুকিয়া ফ'পিয়ে ফু'পিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদে গুম হয়ে বসে রইল।

মঙ্গল হঠাৎ টুকিয়ার হাত ধরে বলে উঠল—এবার আগায় ছাড় টুকিয়া। তুই আর কাউকে বিয়ে কর। যাবার আগে তোদের ওঝা আর ঐ কেরাণীবাবুটাকে বি'ধে দিয়ে সরে পড়ি।

—না, তোকে যেতে হবে না কোথাও। চল্‌ ঘরে, একটা কথা আছে।

বুড়ো এলাচি সগর্বে ও সহস্কারে পঞ্চের হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছে।

সবল

গাঁওবুড়ার পদ সে পরম তাক্কিলোর সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে। সে ও তাব মেয়ের ওপর পঞ্চের কোন নির্দেশ চলবে না।

ওঝা শাসিয়ে গেছে—এবার ভূত লেলিয়ে তোদের বৃকের কল্জে চূরি করাব।

বুড়ো বেঁচেছে। খুশী হয়ে কল্যাণটাকে আশীর্বাদ করে আর দিনরাত স্বচ্ছ জগন্ধি মদ খায়। কোথা থেকে কেমন করে আসে, সে খবরে তার তিলমাত্র ঔৎসুক্য নেই।

টুকিয়া আর মঙ্গলের ব্যস্ত সংসার যাত্রা শুরু হয়েছে এদিকে। ভোরে উঠেই মঙ্গল একবোঝা দাঁতন মাথাখ নিয়ে সহরে যায়। অত বড় জোয়ানের ঘাড়টাও দাঁতনের ভারে বেকে যায়। এর একটু রহস্যও আছে। বোঝার ভেতর প্রচ্ছন্ন থাকে কমপক্ষে দশটি বোতল মদ—বাড়িতে লুকিয়ে চোলাই করা। সহরের একটা আড্ডায় এগুলির গতি ক'রে মঙ্গল ট'য়াক ভারী ক'রে ফিরে আসে।

সিকি আধুলি টাকা। মঙ্গল জীবনে এই প্রথম নিছ হাতে রূপো ছুঁয়ে দেখলো। অপূর্ব এর স্পর্শস্থ, এ এক পাতুময়ী মায়া। একটা নতুন নেশা। জংলীও আজকাল গোলাপী গেঞ্জী গায় দেয়। টুকিয়া দাবান দিয়ে গা ধোয় আর চুমকি বসানো কালো শাড়ী পরে।

চন্দ্রগ্রহণের দিন। আজ সন্ধ্যা থেকেই ডোম-গাঁ প্রায় জনশূন্য। সবাই গিয়ে জড়ো হয়েছে সহরে। গ্রহণ লাগলেই গৃহস্থদের ঘরে ঘরে তারা দান কুড়িয়ে ফিরবে।

রাত্রিকালে বুড়ো এলাচিকে খাইয়ে শুইয়ে টুকিয়া মঙ্গলের ঘরে এল। দুজনে একসঙ্গে খেতে বসল—ভাত মাংস মদ। চোলান মদের

ফসিল

জালাটা আর গোটা কয়েক খালি বোতল সম্মুখে রাখা। আগামী কালের পণ্যসস্তার আজ রাত্রেই গুছিয়ে রাখতে হবে।

পাতাড়ী ঝর্ণার মত খল খল করে হেসে টুকিয়া মঙ্গলের মাথাটা জড়িয়ে ধরে। একান্তভাবে তারই দাফিণ্যের ওপর বাদের নির্ভর, এমন দুজনকে সে দুর্গতির হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। ভাঙা সংসারকে সে আবার নিজের মহিমায় জুড়ে দিয়েছে। বুড়া স্ত্রী, মঙ্গল স্ত্রী, সে স্ত্রী, আরও একজন—সেও আজ তার রক্তের অঙ্ককারে সুখসুপ্ত।

মঙ্গল বলে—মাঝে মাঝে আমার ভয় করে রে টুকিয়া। কখন আবার পরা পড়ে যাই। বাঁচাবি তো?

—হাঁ রে হাঁ, বাঁচাব।

—তা তুই পারিস। তুই যাহু জানিস টুকিয়া। মঙ্গলের মনের মেঘ কেটে যায়, ও হাসতে থাকে।

—মঙ্গল মুণ্ডা হাজির হয়! ঘরের বাইরে দরজার কাছেই কনেষ্টবলের গলার হাঁক শোনা গেল। মঙ্গলের চোখ থেকে মুহূর্তের পূর্বের নির্ভরতার আভাটুকু গেল নিভে। টুকিয়া মুখে আঙুল ছুঁটয়ে ইসারায় জানিয়ে দিল—চুপ।

দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে দাঁড়ালো টুকিয়া। নেশায় পা বেসামাল। বিশ্রান্ত শাড়ীটাকে একটু গুছিয়ে জড়িয়ে নিয়ে দুয়ার খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। কপাটের শেকলটা দিল তুলে।

গ্রহণের অঙ্ককারে ছেয়ে রয়েছে পৃথিবী, বাইরের কিছু স্পষ্ট ঠাহর হয় না। টুকিয়া ডাকলো—কে?

—সতের নব্বয়ের বদমাস মঙ্গল মুণ্ডার ঘর এইটা না?

—হাঁ।

সবলা

—তুই কে ? একজন কনষ্টেবল এগিয়ে এসে টুকিয়ার মুখের ওপর লণ্ঠনটা তুলে ধরলো ।

—আমি মঙ্গলের জরু ।

—মঙ্গলকে বাইরে আসতে বল ।

—সে তো ঘরে নেই, শিকারে গেছে ।

—বেশ, তা হ'লে তুই সরে যা । ঘরের ভেতরটা একবার দেখে রিপোর্ট লিখে নি ।

—ঘরের ভেতর কেন যাবি সিপাহিজী ? আমি যা বলছি, তোরা তাই লিখে নে ।

—ও, বুঝেছি । একজন কনষ্টেবল-টুকিয়ার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে উদ্ভত হ'ল ।

টুকিয়া বললো,—দাঁড়া সিপাহিজী, একটা কথা আছে । কনষ্টেবলটা টুকিয়ার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইল ।

—এঃ, নেশাতে যে একেবারে গলে রয়েছে গো—অপর কনষ্টেবলটা ও এগিয়ে এল ।

চালার খুঁটোতে বিলোল দেহভার হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল টুকিয়া । ঠোঁটে সূক্ষ্ম স্নেহলিখা দুঃস্বাদা হাসির একটু ছায়া । বললো—বড মেহেরবান আপনি সিপাহিজী । গরীবকে একটা বিড়ি পাওয়ান দেখি ।

বিপ্লব শাড়ীর আঁচলটায় হঠাৎ একসঙ্গে দুটো প্রলুক হাতের ক্রুর আকর্ষণ । টুকিয়া অল্পভব করলো শুধু । প্রতিরোধের ছরাশায় তার অবশ হাতটা মাত্র চমকে গিয়ে স্থির হয়ে রইল ।

ঘরের ভেতর একটা শব্দ । পাথুরে মেঝেতে ঠোকর-লাগা শানিত টাঙির হিংস্র নিকণ !

ফসিল

টুকিয়া হঠাৎ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে কনষ্টেবল দুজনের হাত দুটো ধরে বললো—শীগগির চলো এখান থেকে। একটু দূরে, আরে' অন্ধকারে।

শাস্ত রাত্রির বাতাসে সহরের দিক থেকে ভেসে আসছে ভিক্ষার্থী ডোমদের কলরব। গ্রহণকা দান! গ্রহণকা দান!

গ্রহণ ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ। আবার চাঁদের মুখ খুলেছে। চারিদিকে ফুটে উঠেছে নতুন শুক্রিমার স্মৃতি।

একদল বনশূয়ার নামলো আলুর ক্ষেতের ওপর। হ'স হলো টুকিয়ার। তাড়াতাড়ি নালার জলে স্নান সেরে ক্ষেতের আল ধরে ঘরের দিকে চললো।

ভেজা কাপড়ে আস্তে আস্তে ঢুকে দেখলো মঙ্গল অঘোরে ঘুমোচ্ছে। টুকিয়া ঠেলে ঠেলে তার ঘুম ভাঙালো।

গোত্রান্তর

মকতপুর। কাঁচা সড়কের ওপর এই তো একটা জরাজীর্ণ বাড়ী !
খোলার চালের পুরাণো বাঁশের ঠাট থেকে ঘণের ধলো ঝরে পড়ে। তিন
বছর পালেন্তারা পড়ে নি। ঘরে এক পাল মাগুঘ—কাচা বাচ্চা, মোতা
কাথা আর নোংরা লেপ তোষকেব জঙ্গাল। এই তো সঙ্কয়ের স্ট্রাইট
হোম !

একা বড়দার গোনাপ্তনতি নাসোহারাব জোরে ভাতকাপড়ের ক্ষুধা
আর বাগিয়ে রাখা যায় না। সবদিকে ব্যাবহাজলা নিম্নমভাবে ছেঁটে
ফেলা হয়েছে। এগন কোপ পড়ছে পেটের ওপর। দি চিনি চা—
সংসারের বৃত্তক্ষু জিভটার এক একটা অংশ বড়দা প্রতিমাসে ছুরির পোঁচ
দিয়ে কাটছেন। এ ছাড়া উপায় নেই। কে জানতো, সঙ্কয় এত লেখা
পড়া শিখেও রোজগারের বেলায় এমন ঝুঁটো হয়ে বসে থাকবে। এক
আধ দিন নয়, আজ চার বছর ধরে।

বিকেল বেলায় হাল্কা ঝড়ে বাড়ার স্তম্ভে শিরিষ গাছে শুকনো
স্ট্রাইটগুলো কুম কুম করে বাজে, মোটা ধুড়ুরের বোলব মত। এই
সময়টা বেশ লাগে। সারাদিনের সঞ্চিত আলস্য অবসাদে মিষ্টি হয়ে
শুঠে।

বারান্দায় বসে এক গেলাস গুড়ের তৈরী চা হাতে নিয়ে সঙ্কয় চুমুকে
চুমুকে তার নিত্যদিনের ভাবনাগুলির আশ্বাদ ঝালিয়ে নিচ্ছিল।

—যে যার পথ দেখ। বড়দা সময়ে অসময়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।
কিন্তু বছর চারেক আগেকার কথা। পরীক্ষার দিন এই বড়দা নিজের
হাতে টিফিন কেয়িয়ারে খাবার নিয়ে কলেজ হলের গেটে দাঁড়িয়ে
থাকতেন। সেও এক দিন গেছে। বড়দার মনের সুপ্ত সাধ আকাঙ্ক্ষাগুলি

ফসিল

সেদিন ছিল দুঃখ অভাবের কালিতে মাথা—বিনম্র কামনার মালার মত। এই অভাবের গ্লানি একদিন ধুয়ে মুছে যাবে। সঞ্জয়ের একটা চাকরী হবে—রূপোর কাঠির স্পর্শ মকতপুরের দত্তবাড়ী স্বাচ্ছন্দ্য বাক-বাক করে উঠবে। এই ছিল অবদারিত সত্য।

এম-এ ডিগ্রী। সচ্চরিত্রতা, স্বাস্থ্য আর খেলাধুলার দশটা সার্টিফিকেট, বিলিতি পত্রিকায় ছাপা তার নিজের লেখা তিনটে অর্থনীতির প্রবন্ধ, গান আর অভিনয়ের মেডেল, ভূমিকম্পে স্বকঠোর সেবাত্রতের প্রশংসাপত্র—সঞ্জয়ের বহু ও বিচিত্র প্রতিভা একটা মোটা বাগিলে বাঁধা হয়ে বাক্সে পড়ে আছে। চার বছর দরখাস্তবাজি করে একটা চাকরী জোটে নি। বড়দা হতাশ হয়ে পড়েছেন। মায়ের মুখেও গঞ্জনাবাক্য উথলে ওঠে।

অপ্রতিভ হয়ে গেছে সঞ্জয়। কিন্তু এই দ্বিকৃত চারটি বছরের প্রতি মুহূর্তের ভাবনায় তার অনেক মোহ ভেঙে দিয়েছে। আগে এমনি অবস্থায় পড়লে লোকে বিবাগী হয়ে যেত। কিন্তু সঞ্জয় অগাধ ধাতুতে তৈরী। বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী ধনবিজ্ঞানের সমস্ত সূত্রগুলি তার জানা আছে।

সঞ্জয় বুঝেছে, এখানে প্রত্যেকটি স্নেহ পণ্য মাত্র। প্রত্যেকটি আশীর্বাদ এক একটি পাণ্ডনার নোটিশ। চার বছর বয়স—এই ভাই-বোন পুতুল, মাথা ধরলে চুলে হাত বুলিয়ে দেয় ঠিকই। কিন্তু সঞ্জয় জানে, একরত্তি মেয়ের এই হৃদয়তার মধ্যে লুতাতস্তুর মত কী সূক্ষ্ম কারবারী বুদ্ধি লুকিয়ে আছে। কাজ শেষ হলেই সোজা দাবী জানাবে—সিন্ডের ফিতে চাই আমার।

ওপর থেকে দেখতে কী সুন্দর! মা বাপ ভাই বোন, আপন জন,

গোত্রাস্তর

আত্মীয়তার নীড়। কত গালভরা প্রবচন! একটু আঁচড় দিলেই চামড়ঃ ভেদ করে দেখা দেয় নির্লজ্জ মহাজনের মাংস। সঞ্জয় এক এক সময় হেসে ফেলে। তবে এ তব্ব নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের শিরায় শিরায় এই রীতি গড়িয়ে আসছে বহু হাজার বছর ধরে। সেই গুহা-মানবের গৃহধ্বংস থেকে স্বরূপ করে মকতপুরের দন্তবাড়ীর সংসারকলা। প্রেম প্রণয় আত্মীয়তা—লঙ্কা গুড আদা মরিচ। যে ক্রেতা সেই আপন জন!

স্বমিত্রাও অনেকদিন এদিকে আসে না। প্রেমের হাওয়া হয়তে ঘুরে গেছে। আশ্চর্য্য কিছু নয়। স্বমিত্রার বাবা অভয়বাবুরও মতিগতি কিছুদিন থেকে উল্টো রকমের দেখাচ্ছে। বাড়ী মটগেজ দিয়েছেন। স্বমিত্রারও কি পাত্র জুটে গেল?

গেল বিজয়া দশমীর দিনও সে প্রণাম করতে এসেছিল। চাঁপা রঙের সাড়ীতে অমন কালো মেয়েটাকেও দেখাচ্ছিল কত স্বন্দর!

...চন্দনের টিপপর্য্য স্বমিত্রার কপালটা অলস হয়ে পড়ে রয়েছে ছুমিনিট ধরে, সঞ্জয়ের পায়ের ওপর। বয়স্কা কুমারী মেয়ের যৌবন অভিমানে যেন মাথা খুঁড়ছে। স্বমিত্রা ভালবেসে ফেলেছে।

পুরানো দিনের এসব কাহিনী ভাবতে ভালই লাগছিল। কিন্তু বৌদি এসে সামনে দাঁড়ালেন। —অভয়বাবুদের খবর শুনেছ ঠাকুরপো?

—না।

—সাবরেজিষ্টার নবীনবাবুর সঙ্গে স্বমিত্রার.....।

—বিয়ে, এই তো!

বৌদি হেসে চলে গেলেন। হাসিটা তিরস্কারের মতই। ষাক্, সবচেয়ে বড় ভুলটাও ভেঙে গেল। এই একটা লাভ। ঐ চোখের জল, প্রণাম, লজ্জানত মুখ,—কী ক্ষুরধার পবিত্র কোকেটি! সে চিনেও চেনে নি। এটা তারই অপরাধ।

ফসিল

সময় থাকতে সরে পড়া চাই। নইলে এই নীলামী মহলে তার সমস্ত মনুষ্যত্ব অতি সস্তায় বিক্রিয়ে যাবে। এই ভগ্নহাস, ভদ্র সংসারের চলনাকে পেছনে রেখে চলে যেতে হবে। পশুর মত নিছক একটা গোত্রমোহের তাড়নায় সমস্ত জীবনের ঈষ্ট এখানে সে বাঁধা রাখতে পারবে না। সঞ্জয় বুঝেছে, তার সব চেয়ে বড় প্রয়োজন গোত্রান্তর। এই গৃহকূটের রহস্য সে ধরে ফেলেছে।

সঞ্জয় চলে যাচ্ছে দূর দেশে। রতনলাল সুগার মিলে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরী। মাইনে কমবেশীর প্রশ্ন কিছু নেই। এই ত্রিশ টাকার চাকরীর মধ্যে সে দেখেছে অজস্র মুক্তির প্রসাদ।

বিদায়ের দিন মকতপুরের এই জরাজীর্ণ বাড়ীটা যেন আর একবার সমস্ত যাতু বল নিয়ে সঞ্জয়কে দমিয়ে দেবার মতলব করলো। ভাই বোনেরা বাস্তু বিছানা বেঁধে দিল। পুতুল সকাল থেকে আঁচিলের মত গায়ে লেগে আছে—যেতে নাহি দিব গোছের ঈচ্ছেটা। বাবার কথাগুলোর কটু ঝাঁজ উবে গেছে, সুস্থভাবে তামাক টানতে পারছেন না। মা রান্নাঘর থেকে এখনও বাইরে আসেন নি। উল্লুনের সামনে বসে যেন তাঁর বিগত অদাক্ষিণ্যের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। মাছের তরকারীই রাখলেন তিন রকমের।

বড়দা বিচলিত হয়েছেন সব চেয়ে বেশী। বললেন—ভাল মনে যাও, আর মনে রেখ, উজোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করেই। তুমিই একদিন ঐ মিলের মালিক হয়ে বসতে পার। স্তর রাজেন কি ছিলেন? সব সময় প্রসপেক্টের দিকে লক্ষ্য রাখবে।

মোটর বাসে উঠে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সঞ্জয়।

একদিকে নির্জলা ফল্গু, আর তিনদিকে জঙ্গল। মাঝে চুরাশী

গোত্রান্তর

পরগণা। জঙ্গলের ভেতর গ্রাণ্ডকর্ড লাইন নাড়ীর মত ধুকধুক করে।
একটা রামখড়ির টিলার রেঞ্জ চলে গেছে কোডারমা স্টেশন পর্যন্ত।

মিল এলাকার নাম রতনগঞ্জ—একটা বাজার আর দূরে ও কাছে
কুলি ও কাম্‌চারীদের বাসা। চুরাশী পরগণার দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে
আলবাধা ঠাঙ্গা শাকসব্জী ও আগের ক্ষেত। ঠুঁটো ঠুঁটো কাকতাড়িয়া
মৃতি, শুয়োর খেদাবার চালা, আঁকা বাঁকা নালা আর মাঝে মাঝে জল
সেচবার বড় বড় কাঠের লাঠা, মাস্তুলের মত ভেসে আছে সবুজ সাগরে।

আগের ফসল পেকে ওঠে। দেড় মাস্তুলের সমান লম্বা লম্বা ঝুজ
দাড়া, এক এক হাতের পাব। সবুজ রেশমী ফালির মত মাথাভরা
পাতার নিশান। তুরী ছত্রি আর আহীরদের বস্তু—যাদের হাড়ের
জলের সারে রত্নসম্ভবা হয়েছে চুরাশী পরগণার মাটি।

মিলের মালিক রায়বাহাদুর রতনলাল অতি সজ্জন লোক। একটা
নগণা প্যানম্যানকে আপনি বলে সম্বোধন করেন। প্রাতঃস্নানের আগে
বাগানের যত পিপড়ের গর্ভে মুঠো মুঠো চিনি ছড়িয়ে আসেন।

ক্যাসমুন্সী সজ্জয়। রায়বাহাদুর সজ্জয়কে আশ্বাস দিলেন।—এই মিল
তোমার। এর উন্নতি হ'লে তোমারও উন্নতি হবে। কাছ দেগাও,
এখানে প্রসপেক্ট আছে।

কিন্তু মাসের পর মাস, চালান রসিদ রেজিষ্টার আর লেজার ঘষে,
টাকা নোট আর রেজকি ঘেঁটে আঙুলের ডগা বিঘিয়ে যায়। ক্রাশিং
মেশিনের শব্দ, ছোবড়ার পাহাড় আর রাবগুড়ের গন্ধে প্রসপেক্টের টিকি
খুঁজে পাওয়া যায় না। সজ্জয়ের মনেও ওরকম কোন ভ্রমো আশার
প্রগল্ভতা নেই। এই সব পয়োমুখ ধনকুন্তদের রীতিনীতি তার ভাল
রকমই জানা আছে।

প্রসপেক্ট নয়, আরও বড় ও কঠোর এক সাধনার ভার নিয়ে সজ্জয়

ফসিল

এসেছে এখানে। নিঃশেষে লোপ করতে হবে তার-পুরাতন সত্তাকে, ফেরারী আসামীর মত।

অদৃত চরিত্রের একটা লোক সজ্জকে ভাবিয়ে তুলেছে খুব! ৬২ নাম নেমিয়ার। লোকটা কর্তৃপক্ষের চোখের বিষ। আজ পাঁচ বছর ধরে এখানে লোডিং মুল্লারী চাকরী করছে। ত্রিশ টাকায় আরম্ভ করে এখন এসে ঠেকেছে পনের টাকায়। লোকটার ছায়ার মধ্যে দুর্ভাগ্যের ছোয়াচ।

একে কুৎসিত, তার ওপর প্লুরিসি। সপ্তাহে তিন দিন টেবিলে পাজর চেপে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। দেখে মনে হয় লোকটা মেরুদণ্ড-হীন, নইলে কেন্নোর মত অমন গুটিয়ে থাকিয়ে পড়ে থাকা যায় না।

তা ছাড়া আছে রুক্ষিণী—নেমিয়ারের বোন। রতনলাল মিলের প্রবীন অর্ধাচীন সবাই সজ্জকে সাবধান ক'রে দিয়েছে—ঐ ভাইবোনের খপ্পর থেকে সামলে থেক বাঙালীবাবু।

নেমিয়ার গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ এসে একদিন বলে গেল—এক নম্বরের কুঁয়োর জল ছাড়া অল্প জল থেয়োনা বাবুজী। ম্যালেরিয়া হবে।

আর একদিন কয়েক শিশি আইডিন, ক্যাণ্ডর অয়েল আর কুইনিনের বড়ি দিয়ে গেল।—তোমার জন্ম নিয়ে এলাম কোডারমা হাসপাতাল থেকে।

সজ্জ শুধু অপেক্ষায় আছে, দেখা যাক এই নিষ্কাম প্রীতির পরিণাম কোথায় গিয়ে ঠেকে। তিন সপ্তাহের মধ্যে নেমিয়ারের ছদ্মবেশ ধর পড়ে গেল। অফিসে খাতা লিখছিল সজ্জ। মুগ্ধ তুলে তাকাতেই দেখলে; নেমিয়ার দাঁড়িয়ে, ছোট ছোট চোখ দুটো মিট মিট করে জ্বলছে।

নেমিয়ার বললো—এইবার একটা বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে ফেল

গোত্রাস্তর

বাবুজী। তুজনে একসঙ্গে শিকার কবা যাবে। রোজ পরগেসের রোষ্ট, দোয়াস্ত। মহয়ার সঙ্গে জমবে ভাল।

সঞ্জয়কে নিরুৎসাহ দেখে একবার কি ভেবে নিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললো—পাঁচটা টাকা লেন দাও তো বাবুজী। আসছে মাসে তাহ'লে তুমি পাবে ছটাকা আট আনা।

সঞ্জয় স্পষ্ট বলে দিল—হবে না, মাপ কর।

নেমিয়ার চলে গেলে সঞ্জয় হাসলো মনে মনে। মাতুষের হৃদয়বৃত্তির চরম পরিচয় সে জেনেছে। অত সহজে ভবী আর ভোলে না। নেমিয়ার কোন ছার।

কিন্তু নেমিয়ারকে চিনতে বোধহয় এখনো অনেক বাকী ছিল।

রাত্রিবেলা জোর বৃষ্টির শব্দের মধ্যে দরজার বাইরে কড়া নাড়ছে কেউ। সঞ্জয় দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলো রুস্তমী, হাতে থাবারের খালা।

—আজ নেমিয়ারের জন্মদিন। নেমিয়ার বলেছে আপনিত তার একমাত্র বন্ধু। তাই এই সামান্য কিছু খাবার নিয়ে এলাম আপনার জন্ত।

কথা শেষ করে রুস্তমী খালাটা নামিয়ে রেখে তক্তাপোষের এক পাশে বস পড়ে হেসে ফেললো।

সঞ্জয় এই প্রথম ভাল করে দেখলো রুস্তমীকে। মেয়েটা কালো আর রোগা। বেশ বুদ্ধিভরা সেয়ানা দৃষ্টি। চোখের কোল দুটোতে রাত-জাগা ক্লান্তির কালিমা। তবু দেখে বোঝা যায়, শুধু ভাল করে খেতে পেলে এই চেহারারই কী চমক খুলবে। বেশ দামী একটা সাড়ী পরে এসেছে, বিলিতি স্বগন্ধি মাখা। সবচেয়ে সুন্দর এর দাঁতগুলো। কথা বলার সময় দেখায় দু'পাটি সারিবাঁধা ছোট ছোট শুক্লমণির মত। হেসে ফেলে যখন, মুকুন্দল কুঁড়ির স্তবকের মত হঠাৎ ফোঁপ ওঠে।

ফসিল

সঞ্জয়ের তন্ময়তা দেখে রুশ্মিণী অশ্রুদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো—আপনি খেয়ে নিন। ততক্ষণ আমি বসছি।

খাওয়া শেষ হতেই রুশ্মিণী উঠে ভরিং হস্তে এঁটো বাসনগুলি তুলে নিয়ে দাঁড়ালো—এবার চলি বাবুজী, অনেক রাত হয়েছে।

সঞ্জয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো—একা যাবে কী করে?

—তা যেতে পারবো। এক ঝলক হাসি হেসে রুশ্মিণী বাইরে পা বাড়তেই সঞ্জয় এঁটো হাতে থপ করে কব্জি চেপে ধরলো।

রুশ্মিণী বললো—আঃ, বাসনগুলো পড়ে যাবে! আগে নামিয়ে রাখতে দাও।

ক’দিন পরে নেমিয়ার অফিসে সঞ্জয়ের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর চোখ দুটো আবার মিট মিট করে জ্বলছে। গলার স্বর নামিয়ে বললে—তুমি রুশ্মিণীকে ভালবাস? প্রশ্নের আঘাতে সঞ্জয় চমকে উঠতেই নেমিয়ার বললো—সে তো সুখের কথা। লজ্জা পাবার কি আছে? আচ্ছা, আমি চলি এবার। দাও।

সঞ্জয়—কি?

—সেই যে পাঁচটা টাকা দেবে বলেছিলে।

—থাক ইউ! নোটটা পকেটে গুঁজে নেমিয়ার আবার বললো—যখন যা দরকার হবে আমায় বেলো।

সত্যিকারের গোত্রান্তর হয়েছে সঞ্জয়ের। পাখী শুধু তার ডাকার আবেগে ধেমল করে সন্ধানী লাভ করে, রুশ্মিণী তেমনিভাবে এসেছে তার কাছে। তার লাক্ষিত পৌরুষকে এই পথের মেয়েটাই সম্মানে লুকে নিয়েছে। জ’লো দাম্পত্যের চেয়ে এ ঢের ভাল। তার বিদ্রোহের প্রথম পরিচ্ছেদ পূর্ণ হয়েছে।

গোত্রাস্তর

বাড়ীর চিঠি আসে। খাটি বাঙালী বাড়ীর চিঠি—কেমন আছ? উন্নতির কতদূর হ'ল? সংসারে বড় টানাটানি। কিছু পাঠাতে পারলে ভাল হয়।

চিঠি আসে কিন্তু উত্তর যায় না। মধ্যে অনেক দূর ব্যবধান—বালুচল আর চোরাবালি। চিঠিগুলি খবরের কাগজের টুকরোর মত মনে হয়। ও তুংখ তো আর একা মকতপুরের দত্তবাড়ীর নয়। এই নেমিয়ারের বৌ তিনটি ছেলে কোলে ক'রে কুঁয়োয় বাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেই খবরের কাটিং আছে নেমিয়ারের বুকপকেটে। পৃথিবীর তুংখ মিটলে দত্তবাড়ীরও তুংখ মিটবে।

রাত্রি হাঁড়িয়া গেয়ে এক একদিন কড়া নেশায় মাগায় জালা ধরে। সঞ্জয়ের চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। রুক্ষিণী অন্তনয় ক'রে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কঁাদ কেন?

চিঠিগুলি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে পুড়িয়ে দেয় সঞ্জয়, ক্ষাপা বামুন যেমন করে তার উপবীত ভস্ম করে।

চুরাশী পরগণা থেকে সহস্র যোজন দূরে, লবণ পারাবারের অপর প্রান্তে ওলন্দাজের দেশে মুদ্রালক্ষ্মী যেন বিদবা হয়েছে। স্বর্ণমান বাতিল হয়ে বাট্টা আর বিনিময়ের হার পাল্টে গেছে রাতারাতি। গিল্ডারের দাম এক দফায় নেমে গেছে সস্তা হয়ে।

সেই ক্ষুদ্র বাণিজ্যবায়ু ছুঁ করে আকাশে পাড়ি দিয়ে এসে ঠেকেছে কলকাতার বন্দরে। টন টন জাভা চিনি নামছে অতি মন্দা দরে। ইণ্ডিয়ান চেম্বারে বিবাদ। মতিপুর চম্পারণ আর কানপুর স্পেশাল বস্তাবন্দী হয়ে কঁাদছে আড়তে আড়তে।

ওলন্দাজের বাজারের অভিষাপ এসে লাগলো রতনলাল মিলে আর

ফসিল

চুরাশী পরগণার আখের ক্ষেতে। মিলের ঘরে ঘরে মুনিবজী নোটিশ পড়ে গেলেন—মাঠনে ও মজুরী শতকরা চল্লিশ কাট।

কিষাণেরা ফটকে ভীড় করছে; চোঙ মুখে দিয়ে মুনিবজী আখের দর ঘোষণা করে দিলেন—এগার পয়সা মণ। যে যে বেচতে রাজী আছ কাল থেকে ফসল পৌছাও।

সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মিল ফটকে কর্মচারী ও কিষাণদের জনতা নিব্বুম হয়ে বসে রইল। রায়বাহাদুরের ছেলে সুখ্যাবাবু চলে গেলেন কোভারমা, ট্রাক টেলিফোনে কলকাতার বাজারের অবস্থা জানতে।

ভীড় সরাতে রায়বাহাদুর, স্বয়ং হাতঘোড় করে এসে দাঁড়ালেন।—বাবালোগ, বুথা ঝামেলা কেন? এ সব নসীবের মার। ভগবানের কাছে জানাও, যেন সুদিন ফিরে আসে।

কিষাণদের মধ্যে মুনিরাম একটু জবরদস্ত। সাফ জবাব দেবার মত জিভ ওরই আছে। মুনিরাম বললো—সরকারী রেট তো পৌনে পাঁচ আনা বাঁধা আছে হুজুর।

রায়বাহাদুর স্থিতহাস্তে বললেন—ওসব সুখস্বপ্ন ছাড়ো ভাইয়া। সে রামরাজ নেই। জাভা মাল এসে ডাকাতি করছে। তমাম আগুন লেগে গেছে। মিল বন্ধ না করে দিতে হয়।

মুনিরামও ছাড়বার পাত্র নয়।—কাল সকালে ঘরের ছেলেমেয়ে-গুলিকে সব পাঠিয়ে দেব। মেহেরবানি করে গুলি চালিয়ে শেষ করে দেবেন। সেই বরং ভাল।

সন্নেহে ভৎসনা করে রায়বাহাদুর বললেন—বেকুব ঘোড়া কাঁহাকা। যা যা ঘরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করু। এ শব্দর পালোয়ান, ফটক বন্ধ করো।

পরাজিত পণ্টনের মত জনতা ফটক থেকে সরে এল। কর্মচারী আর মজুরেরা যে যার ঘরের পথ ধরলো। শুধু সঞ্জয় চললো অন্তরিকে।

গোত্রান্তর

সঙ্গে নেমিয়ার মুনিরাম সুখলাল ছেদি, আরও ক'জন কৃষাণ। বড়ো বটের তলায় পুরানো শিবালয়ের সিঁড়িতে ওরা নিঃশব্দেই এসে বসলো।

সঞ্জয় বললো—এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

মুনিরামের অস্তরাঙ্গা যেন এই বরাভয়বাণীর জন্তু গুং পেতে বসে ছিল। লাকিয়ে উঠে বললো—দোহাই বাঙালীবাবু। একটু উপায় বলে দাও।

কয়েকটা গবেট গোছের কৃষাণ কি জানি কিসের প্রেরণায় ডাক চাড়লো—হর হর মহাদেও!

নেমিয়ার দাত মুখ গিঁচিয়ে গিস্তি করে দমক দিল—এই থবরদার! কোন আওয়াজ নয়।

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর সঞ্জয় প্রস্তাব করলো—কেউ ফসল বেচবে না।

সবাই বললো—ঠিক কথা।

—তোমরা দর নামিও না। ওরা শেষে কিনতে বাধ্য হবে। নতুন মেশিন এসেছে, কাজ ওদের চালু করতেই হবে।

সুখলাল বললো—যদি না কেনে!

মীমাংসা হয়েই যাচ্ছিল, সুখলালের প্রশ্নে আবার বিতণ্ডা শুরু হ'ল।

সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে বললো—কিনতে বাধ্য হবে। লড়াই শুরু করে দাও। বট পাতা ছুঁয়ে সকলে কসম পাও।

সঞ্জয়ের কথার মধ্যে অদ্ভুত এক আশ্বাসের উদ্দীপনা ছিল। যেটুকু সংশয়ের মেঘ ছিল, সকলের প্রতিজ্ঞা আর উৎসাহের ঝড়ে তাও কেটে গেল। পুণ্য বাতাসে শিবালয়ের ঐ নিরেট বধির বিগ্রহটা সত্যিই যেন জেগে উঠলো এতদিনে।

বৈঠক শেষ হ'ল।

ফসিল

রুক্ষিণীর ঘরের কাছাকাছি এসে সঞ্জয় বললো—নেমিয়ার, তুমি এইবার যাও। আজ থেকেই লেগে যাও। খুব ভাল করে অর্গানাইজ কর।

—বহৎ আচ্ছা বাবুজী।

নেমিয়ার চলে গেলে সঞ্জয় অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এম-এ পাশ সঞ্জয় ক্যাশমুন্সী হয়ে গেছে। তার অপমানিত প্রতিভা যেন ব্যর্থ রোষে ফণা নামিয়ে দিন গুণছিল। এইবার ফিরে ছোবল দিতে হবে, যতখানি বিষ ঢালতে পারা যায়।

অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত ভাবনাকে সংগ্রামের সাজে সাজিয়ে তৈরী হ'ল সঞ্জয়। রতনলাল মিলের চিমনিটা অস্পষ্ট দেখা যায়। ডাইনোসরের মত ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে চুরাশী পরগণার বিস্তীর্ণ আখের ক্ষেতের দিকে। ঐ দানবীয় চক্কির স্তূপের ভেতর কোথায় হৃদপিণ্ড লুকিয়ে আছে তা সঞ্জয়ের অজানা নয়, ঠিক সেইখানে তাক করে আঘাত দিতে হবে।

মন ভরা উল্লাস নিয়ে সঞ্জয় রুক্ষিণীর ঘরে ঢুকলো।

আদরের বাড়াবাড়ি দেখে রুক্ষিণী প্রশ্ন করে বসলো—বড় সস্তার সওদা পেয়েছ না? তবুও একদিন তো ছেড়েই দেবে!

—সস্তা? আমার আর কি দেবার বাকী আছে? আর ছেড়েই বা দেব কেন?

রুক্ষিণী যেন একটু অহুতপ্ত হয়েই হাত দিয়ে সঞ্জয়ের মুখ চেপে ধরে বললো—আচ্ছা! আচ্ছা! মাপ করো। আর বলবো না। তবে তুমি নিজেই সেদিন নেশার ঘোরে বলছিলে, আমি নাকি সব্বতের গেলাস, সব্বত নই।

সঞ্জয়ের প্রত্যাশার অপেক্ষা না করেই রুক্ষিণী বললো—আমার কিছু খোক টাকা চাই। একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে।

গোত্রাস্তর

কুন্সিণী গায়ের আঁচলটা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো—বুঝেছ ?
আমার চলবে কি করে ?

—হ্যাঁ বুঝেছি। সঙ্কম গম্ভীর হয়ে গেল।

রতনলাল মিলের সমস্ত মেশিন বন্ধ। অতিকষ্টে দু'চার গাড়ী মাল
যোগাড় হয়েছে। কলকাতার মার্কেটের অর্ডার মেটাবার শেষ দিন
এগিয়ে আসছে। রায়বাহাদুর পাগল হয়ে সদরে এস-ডি-ও'র বাংলোতে
দৌড়দৌড়ি করছেন।

চুরাশী পরগণার ফসল শুকোচ্ছে মাঠে মাঠে। এজেন্টরা গাড়ী
আর টাকার তোড়া নিয়ে বস্তি বস্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে!—মাল ছাড়বে তো
ছাড়। পাতা লাল হয়েছে কি এক আনাও দর দেব না। কিসাণরা
হেসে চুপ করে থাকে।

নেমিয়ার একেবারে উধাও হয়েছে। বাড়ীতেও থাকে না, আফিসেও
আসে না। দাঁড়াকের মত সে দিনরাত চুরাশী পরগণার মাঠে ঘাটে
বস্তুতে উড়ে বেড়ায়। —গবরদার, এজেন্টদের কথায় কেউ ঘাবড়িয়ে
না। রতনলাল মিল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

চুরাশী পরগণার ওপর শকুন উডছে ক'দিন থেকে। গো-মডক
লেগেছে। মুনিরামের একটা ছেলেও মারা গেছে বসন্তে।

সাহরা খেরোবাঁধা খাতা আর তমস্তপের নথি নিয়ে দরজায় দরজায়
হানা দিচ্ছে তাগাদায়। একজন রিক্রুটার ব্রিগ জন তুরীকে গোঁথে নিয়ে
সরে পড়েছে মালয় রবার বাগানের জন্ত। কদম সাগরের রাস্তায় গরুর
গাড়ী লুট হয়েছে; মিলিটারী পুলিশ রুট মার্চ করে গেছে।

পঞ্চপালের মত কোভারমার গয়লারা এসেছে দলে দলে। মোষ
কিনছে পাঁচ টাকায়, ছুধের গরু আট টাকায়, বাছুর বার আনা। সাহরা

ফসিল

চড়া স্বদে রূপোর গয়না বন্ধক নিচ্ছে, পেতল কাঁসার বাসন বিলিয়ে যাচ্ছে
বাটার দরে।

চুরাশী পরগণায় ঘরে ঘরে সেক্ষ হচ্ছে কোনার গাছের পাতা। ঘরে
ঘরে দানা আনাজ নিঃশেষ।

এক মাস হতে চললো। রায়বাহাদুর এজেন্টদের গালাগালি
দিয়েছেন।—যেমন করে পার মাল নিয়ে এস। মার্কেটে আর ইজ্জৎ
থাকে না। মেশিনে মরচে পড়ে গেল।

এস-ডি-ও এসে মিল দেখে গেছেন। পেয়াদা দিয়ে চুরাশী পরগণায়
তেল পিটিয়ে দিয়েছেন!—সব কোই হুঁসিয়ার হো যাও। ফসল ছাড়,
একদিন মাত্র সময় দেওয়া গেল। নইলে কাল থেকেই লয়াবাদ পরগণা
থেকে ফসল আনা হবে।

মুনিরাম আর সুখলাল এল সন্ধ্যাবেলা। ঘোয়া কুকুরের মত চেহারা।
এখনও ভরসা জল জল করছে ওদের চোখে, হাত পেতে হুকুম চাইছে।—
বাবুজী এইবার কি করতে হবে হুকুম দাও।

সঙ্গয় বললো—আর কটা দিন সবুর কর!

মুনিরাম আর সুখলাল চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল।
তাদের কিছু একটা বলবার হয় তো ছিল। বলা আর হ'ল না।

ঘটনাগুলি কেমন ঘোরাল হয়ে আসছে। রায়বাহাদুর এখনও তাকে
ডাকলো না, এই সঙ্কটে একটা পরামর্শের জ্ঞা। আভাসে সঙ্গয় একদিন
জানিয়েও ছিল—যদি বলেন তো কিষাণদের আমি শাস্ত করি।

এদিকে রুস্তগী আবার এক কাঁটা গিলে বসে আছে। হৃদিকেই
একটা ব্যবস্থা এবার করা উচিত। কিন্তু নেমিয়ার ছাড়া কি করে কাজ
হয়। কাজের বেলা লোকটা সত্যিই বড় সহায়!

নেমিয়ার এসে সামনে দাঁড়ালো।

গোত্রান্তর

কেরোসিনের বাতির ময়লা আলো। নোংরা খাকি প্যান্ট, ছেড়া কামিজ, পাখীর বাসার মত কক্ষ চুলে ভরা মাথাটা। কেন্নো নেমিয়ার দাঁড়িয়ে আছে—লোহার মূর্তির মত ঝুঁকু ও কঠিন। গোত্রহীন মান্নমেষ স্বরূপ দেখে আজ সঞ্জয় আঁতকে উঠেছে, বসে আছে মাথা নীচু করে।

নেমিয়ার চাইতে এসেছে মিলের ক্যাশঘরের চাবি। —গিরিগিটির মত চেটে নিয়ে আসবো যা কিছু ক্যাশ আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো। ফাইল রেজিষ্টার ছাঈ হয়ে যাবে! তোমাকে দায়ী করবে কি দিয়ে? কে বলবে কত ব্যালান্স ছিল? দাও, চাবি দাও।

সঞ্জয় ঘাড়টা একবার তুলে তাকালো বাইরের অন্ধকারের দিকে। আলোটা একটু উজ্জ্বল থাকলে দেখা যেত, দম্কা শিহরে তার হাঁটু দুটো থর থর করে উঠলো।

নেমিয়ার যেন ভয়ঙ্কর অর্থহীন এক ব্যালাড গাইছে।—চুরাণী পরগণার রসদ চাই। তারপর দেখবো, লম্বাবাদের সড়ক দিয়ে কোন মরদকা বাচ্চা বাইরের মাল আনতে পারে। কেউ বেচবে না ফসল, ক্ষেতে ক্ষেতে শুকিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাঈ করে দেওয়া হবে। কিষাণেরা সব কসম খেয়েছে। আজ রাত্রে লাঠি মাজা হচ্ছে ঘরে ঘরে। সব তো গেছে, কিন্তু রতনলাল মিলকে দেখে নেবে তারা। মাথা দেবে, মাথা নেবে।

বসন্তে ক্ষতান্ত মুখ, গোল গোল চোখ, বৈটে রোগা ঘুঁটে রঙের চেহারা নেমিয়ার, যাকে চড়ুই পাখীও ভয় পায় না—সেই এসে দাঁড়িয়েছে সঞ্জয়ের স্তম্ভে অতি আসন্ন এক বিপ্লবের কর্মান হাতে নিয়ে।

নেতিয়ে পড়েছে সঞ্জয়। নেমিয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো—অত ভাবনা কিসের কমরেড দাদা! তোমার কিষাণ ফৌজকে খেতে হবে তো। দাও, আর দেবী করো না।

ফসিল

ক্যাশঘরের চাবির তোড়া নিয়ে নেমিয়ার অন্ধকারে পিছলে সরে পড়লো।

উদ্ভাস্তর মত অনেকক্ষণ পায়চারী করে সঞ্জয় এসে দাঁড়ালো ঘরের বাইরে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পেতে। একটা সামান্য দলাদলির এ রুদ্র পরিণাম সে কল্পনা করতে পারে নি। সার্কাস দেখবার জন্ত যে সিংহকে খাঁচার বাইরে আনা হয়েছে, একটু সামান্য খোঁচা দিতেই সেটা এমন বুনো হাঁক ছেড়ে অবাধ্য হয়ে উঠবে, কে এতটা ভেবেছিল।

—নেমিয়ার। অন্ধকারে সঞ্জয়ের ভাঙা গলা কঁপে উঠলো।

দৌড় দিল সঞ্জয়।

রুক্মিণীর ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে মুহূ আলোর সঙ্গে তারমস্তুর বিলাপের মত একটা স্বর ঠিকরে এসে পড়েছে। সঞ্জয় দম বন্ধ করে জানালার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেঝের ওপর লুটোচ্ছে রুক্মিণী। সাড়ীর ভার খসে গিয়ে কোমরে শুধু গেরোটা লেগে আছে। খোপাটা মাটিতে ঘসা খেয়ে নোংরা হয়ে গেছে। কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে ছড়িয়ে রয়েছে এদিক ওদিক। আহত সপিনীর মত রুক্মিণী যেন কোমর ভেঙে অবশ ভাবে পড়ে আছে। মাথাটা শুধু এপাশে ওপাশে আছাড় খেয়ে পড়ছে

রুক্মিণীর প্রাণবায়ু যেন করাল ঝঞ্ঝার মত সমস্ত শরীরে একবার গুমরে উঠলো। এমন অবস্থায় অনেকে তো মারা যায়। রুক্মিণীর কপালেও কি তাই আছে!

অনাবৃত মস্তণ্ণ হাঁটুর ওপর অতি পরিচিত সেই নীল শিরার আঁকা-বাঁকা রেখাগুলি, জঁকের মত ফুলে উঠেছে। ঠোঁটের ওপর দাঁতের পাঁচী চেপে বসে গেছে। চোখের কোণ থেকে তোড়ে তোড়ে জল গড়িয়ে

গোত্রাস্তর

পড়ছে কান ভাসিয়ে। চাপা আর্তস্বর পন্দায় পন্দায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।
ফুসফুসটা ফেটে যায় বৃষ্টি! এই কি মৃত্যু!

কী নিষ্ঠুর বিভ্রম! সমস্ত যন্ত্রণা ধ্বংস করে কপট মৃত্যুর আড়ালে এক
নবজীবনের রক্তবীজ পৃথিবীর মাটিতে হাত বাড়িয়েছে। সঞ্জয় এক লাফে
পিছিয়ে এসে গাছের নীচে দাঁড়ালো।

নেমিয়ার কোথায়? সঞ্জয় এগিয়ে নেমিয়ারের ঘরের দরজার ফাঁকে
টুকি দিল।

কালো প্যান্ট পরে, কোমরে একটা চওড়া বেল্ট ক'সে নেমিয়ার
বসে বসে চিবোচ্ছে বাসি রুটি। হাঁড়ি থেকে ঢেলে পচাই খাচ্ছে এক এক
চুমুক। একটা ধারালো ভোজালী সামনে রাখা। মুখে অদ্ভুত এক
প্রসন্নতা; শুকনো ঠোঁট দুটো নেকড়ের মত হাসছে।

এ-ঘরে ভাই, ও-ঘরে বোন। পুরাকল্পের বর্ষের পৃথিবীর হুজুন
কুপিত ডাইন ও ডাইনী যেন তুচ্ছ করে সর্বনাশের আহ্বান করছে!

নদীতে বান ডাকে, ভয়াল জলের তোড় আসে গর্জ্জন করে। জেলে
তার ষথাসর্বস্ব ঘাড়ে তুলে দৌড় দেয়। সঞ্জয় দৌড়ল।

সড়ক না ধরে, মাঠের ঢালু খাড়াই খাদ গর্ত ডিঙিয়ে সঞ্জয় দৌড়ে
চলেছে। মিল ফটকের আলোটা ঘোলাটে আলেয়ার মত কুয়াশায় দপ
দপ দপ করছে। আর বেশী দূর নয়।

মকতপুরই বা কতদূর। আজ শেষ রাত্রে ট্রেন ধরলে কাল বিকালেই
পৌছে যাবে। শিরিষ গাছে হয়তো স্ন'টি পেকেছে। সোনালী বৈকালে
হালকা বাতাসে বাজে মোটা ঘুড়রের বোলার মত। বড়দা বারান্দায়
বসে গুড়ের তৈরী চা খান। মা উঠোনে বসে লক্ষ্মীর পিঁড়ি ধুতে
থাকেন। পুতুল আকাশে আঙুল তুলে শঙ্খচিলের ঝাঁক গোণে—এক
তুই তিন। স্মিত্রা। হয়তো তার বিয়ে হয়নি। তার শবরীদৃষ্টি

ফসিল

ঘুরে বেড়ায় মকতপুরের বাড়ীর জানালার—পথে—ধাবমান মোটর বাসের দিকে ।

রায়বাহাদুর রতনলাল, সূর্য্যবাবু, মুনবজী । সামনে টুলের ওপর বসে আছে সজয়—বিশীর্ণ রোগীর মত । ভাঙা কাঁসরের মত গলার আওয়াজ । এক গেলাস গরম দুধ খেতে দেওয়া হয়েছে সজয়কে !

রায়বাহাদুর ডাকলেন—শঙ্কর পালোয়ান, কাশফরে পাহারা বসাও । নেমিয়ার বাবুজীকে ছুরি দেখিয়ে চাৰি নিয়ে গেছে । আজ রাতেই ছুরি করতে আসবে । চোট্টা শালাকে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলতে হবে ।

মুনবজীকে হুকুম দিলেন—বাবুজী ষ্টেশনে যাবেন । এখনি একটা ভাল ঘোড়ায় গদি চড়িয়ে দাও । আর আমার সিন্দুক খোল, বকশিস দিতে হবে । বড় ইমানদার ছেলে !

আদাব জানিয়ে সজয় উঠলোঁ । রায়বাহাদুর বললেন—কটা দিন বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর । তারপর এসো আমার গোরখপুর গিলে—শও রুপেয়; তন্থা ।

রামখড়ির রেঞ্জের গায়ে গায়ে সরু জংলী পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সজয় । আকাশের বুকটা লাল হয়ে গেছে । কিষাণেরা আগুন জালিয়ে দিয়েছে নিজের নিজের ক্ষেতে । পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে চুরাশী পরগণা ।

সামনের মাঠটা পার হলেই ষ্টেশন, ডিষ্ট্যান্ট সিগনালের আলোটা নীল তারার মত ভেসে রয়েছে । ছপ্ করে একটা শব্দ । ঘোড়াটা একটা শ্রোতে পা দিয়েছে ।

সজয় ঘোড়া থেকে নেমে শ্রোতের ধারে বসে আজলা ভরে জল খেল । গেরস্থের মুগী চুরি করে খেয়ে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গৌপের রক্ত চাটছিল । সেও এসে জল খাবার জন্ত শ্রোতে মুখ নামালো ।

